রাতের ট্রেনের সঙ্গী

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরি



শিশু সাহিত্য সংসদ

রাতের ট্রেনের সঙ্গী

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরি

শিশু সাহিত্য সংসদ



রাতের ট্রেনের সঙ্গী

রাতের ট্রেনের সঙ্গী

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরি



শিশু সাহিত্য সংসদ

RATER TRAINER SANGI
(A Collection of Stories for the Young)
by Abhijnan Roychowdhury

ISBN : 978-81-7955-248-3

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৪

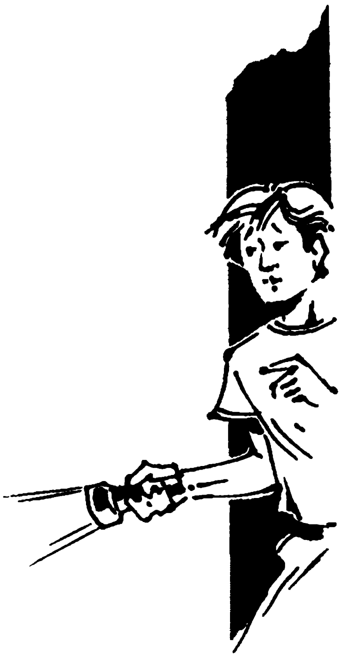
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : চন্দন বসু

প্রকাশক : দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.,
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক : এ. পি. প্রিন্টার্স, ৮/১ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা-৭০০ ০৬৭

আমার স্ত্রী
শাশ্বতী রায়চৌধুরীকে

সূচি



রাতের ট্রেনের সঙ্গী

আমি রোমে যাচ্ছি শুনে জিওভানি ওর চোখ থেকে রিমলেস চশমাটা খুলে টেবিলে নামিয়ে রেখে বলে উঠল—রোম? ভারি সাংঘাতিক জায়গা, ঠগজোচ্চোরে শহরটা ছেয়ে গেছে।

পাশে বার্তোচ্চি খুব মনোযোগ দিয়ে কম্পিউটারে একটা প্রেজেন্টেশান নিয়ে কাজ করছিল। চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমার দিকে ফুটখানেক এগিয়ে এসে বলে উঠল—ঠিকই বলেছে জিওভানি। উত্তর ইতালি যতটা ভালো, ওদিকটা তেমন ভালো নয়। আর রোম তো তাদের মধ্যে সব থেকে এগিয়ে। চোরেদের রাজত্ব। তা যাচ্ছ যাও। শুধু রোমা টার্মিনি স্টেশন হয়ে যেয়ো না। অনেকেই ওখানে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে।

আমি একটু থতোমতো খেয়ে বলে উঠলাম—কিন্তু ওটাই তো রোমের মেন স্টেশন। আমার ট্রেনের টিকিট তো রোমা টার্মিনি পর্যন্তই।

বার্তোচ্চি একটু যেন হতাশ হয়ে বলে উঠল—উঃ হুঁ, আগে আমাদের জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত ছিল। তা রাতের দিকে পৌঁছোচ্ছে না তো! রাত দশটার পরে স্টেশন চত্বরটা প্রায় ঠগজোচ্চোর গুন্ডাদের দখলে চলে যায়। রাত এগারোটার পরে তো কোনো দূরপাল্লার ট্রেন ওখানে দাঁড়ায় না পর্যন্ত। অন্য লাইন দিয়ে যায়।

আমার ফ্যাকাশে হওয়া মুখ আর নীরবতা লক্ষ করে এবার জিওভানি জিজ্ঞেস করে—ক-টায়? ক-টায় পৌঁছোচ্ছে?

—রাত সাড়ে এগারোটা। টিকিটটায় একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট ছিল। তাই...। জিওভানির মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যাই।

—বাহ্। শুধু ডিসকাউন্টের জন্য ওরকম একটা সময়ে...। তা হবে না-ই বা কেন? কে-ই বা যাবে ওই সময়ে! তার ওপর তুমি তো আবার একা যাচ্ছ—তাই তো?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। সত্যিই ভুল হয়েছে। ওদের জিজ্ঞেস না করে হঠাৎ এরকম রোম বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করাটা একদম ঠিক হয়নি। বার্তোচ্চি ইতালিয়ানে জিওভানির সঙ্গে কীসব বলতে শুরু করল খুব উত্তেজিত হয়ে। এটুকু বুঝলাম, তা রোম প্রসঙ্গেই।

আমি ইতালিতে এসেছি চার সপ্তাহের জন্য। তার মধ্যে দুটো সপ্তাহ অলরেডি ওভার। আর ইতালিতে এসে রোমে যাব না, তাই হয় নাকি। সেই জন্যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইন্টারনেট ঘেঁটে নিজেই রোম যাওয়ার প্ল্যান বানিয়েছিলাম, তখন কে জানত যে এরকম একটা বিখ্যাত শহরে এরকম একটা কুখ্যাত স্টেশন আছে।

রোমা টার্মিনির ওপরে ইন্টারনেটে সার্চ করতেই বোঝা গেল যে জিওভানিদের কথা একটুও মিথ্যে নয়। এমনকী, এরকমও হয়েছে যে নকল চেকার এসে টিকিট চেয়ে নিয়েছে—আবার খানিক বাদে আরেকজন এসে টিকিট নেই বলে বিশাল ফাইন করেছে।

টিকিটটা ক্যানসেল করব কি করব না— এরকম দ্বিধায় পড়ে আর ক্যানসেল করাও হয়নি। অন্য টিকিট সুবিধেমতো পাইওনি।

তা, আজ ট্রেনে বসে জিওভানি আর বার্তোচ্চির কথাই মনে হচ্ছিল। একা বসে আছি। ঘড়ির কাঁটায় এখন রাত বারোটা। রোমা টার্মিনি আরও মিনিট কুড়ির পথ। অর্থাৎ যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়।

ইউরোরেল সাধারণত সময়ে চলে। আমার এমনই ভাগ্য যে আজকেই ট্রেনটা লেট। তাও বেশ যাচ্ছিল। হঠাৎই খানিকক্ষণ আগে একটা বিকট আওয়াজ করে ট্রেনটা থেমে গেল। বেশ দুলে উঠল ট্রেনটা। তারপর থেকে নো নড়নচড়ন। সিট থেকে উঠে জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখার উপায় নেই।

অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতে, মনে হল জলে আলো পড়ে চিকচিক করছে। ট্রেনটা বোধ হয় ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ সমুদ্রের ধার দিয়ে আসছিলাম। সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ।

আমার কামরাটা একদম ফাঁকা। খানিক আগেও বেশ কয়েকটা লোক ছিল। এখন কেউ নেই। আগের স্টেশনে নেমে গেছে। ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসতে গিয়ে চমকে উঠলাম। আমার ঠিক পাশেই প্যাসেজ। আর তার ঠিক অন্যধারে একজন বৃদ্ধ লোক বসে আছে। একে তো এতক্ষণ দেখিনি। কোত্থেকে উঠল?

লোকটার পায়ে রংচটা খয়েরি গামবুট। গায়ে খুব পুরোনো, কিন্তু দামি লেদারের জ্যাকেট। মুখে সাদা দাড়ি, চুলও সব সাদা! চোখে গোল ফ্রেমের চশমা, নাকের সামনের দিকটা একটু বাঁকানো। চোখের নীচটা একটু বসামতো। মুখটাকে তাই কঠিন দেখাচ্ছে। হাতের ছোটো লাঠিটা পাশে রাখা। চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে মাথাটা একটু নাড়িয়ে বলে উঠল—চাও! অর্থাৎ হ্যালো।

আমি 'চাও' বলতেই ইংরেজিতে বলে উঠল—গত দু-সপ্তাহ কীরকম লাগল ইতালি?

আমাকে থতোমতো খেতে দেখে ফের বলে উঠল—তা সন্তুর জন্য খুব মন কেমন করছে তো?

এবার আমার সত্যিই অবাক হওয়ার পালা।

—তা, আপনি কী করে জানলেন? আপনি কে? একটু ধরা গলায় বলে উঠলাম।

—লুকার নাম শুনেছ?

—নাহ, কে লুকা?

লোকটা একটু যেন হতাশ হয়েই বলে উঠল—লুকার নাম শোনোনি? এত বড়ো ম্যাজিশিয়ান!

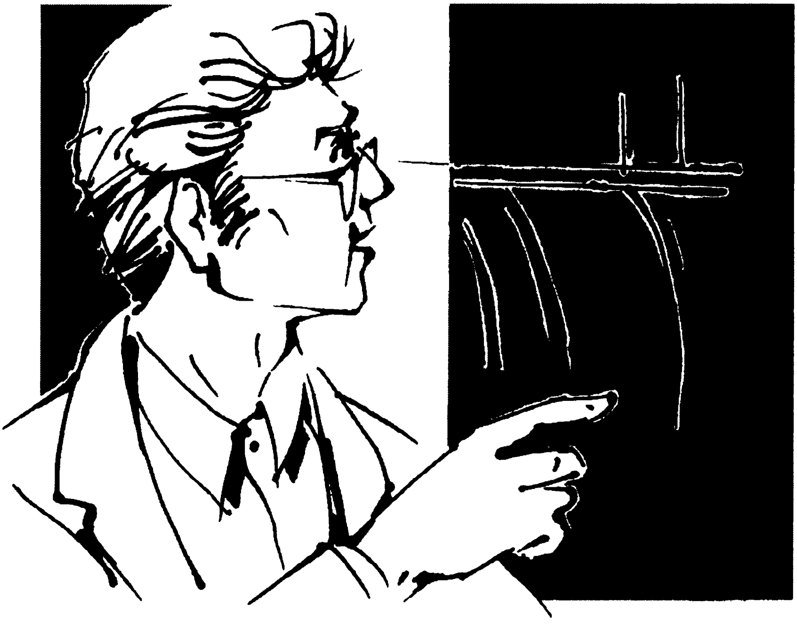
একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—অবশ্য অনেকদিন তো হয়ে গেল। লুকা ছিল এক বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান, সে লোকের মনের কথা বুঝতে পারত। যে সব বাচ্চা কথা বলতে শেখেনি। তারা কী বলতে

চাইছে—তাও বলে দিত। চেয়ার টেবিল বাতাসে ভাসিয়ে রাখতে পারত। যেকোনো লোকের মন বশে আনতে পারত।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল বৃদ্ধ লোকটা—কিছু কিছু ঘটনা আগে থেকে বলে দিতে পারত। কোনো বড়ো দুর্ঘটনা কবে হবে, কীভাবে হবে তা আগে থেকেই বলে দিতে পারত। কয়েকবার বলে দিয়ে লুকা সবাইকে হকচকিয়ে দিয়েছিল। লুকা ছিল সর্বকালের সেরা ম্যাজিশিয়ান। বুঝলে?

অধৈর্য হয়ে বলে উঠি—কিন্তু আমি আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম, লুকার কথা নয়, কী করে আপনি বুঝলেন যে আমার ছেলের নাম সন্তু? আমি দু-সপ্তাহ এখানে আছি?

মাথার ওপরের বাঙ্কে ব্যাগটা রাখা ছিল। একবার আড়চোখে দেখে নিলাম। নাহ, ব্যাগটাকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে আমি দু-সপ্তাহ আগে ইতালিতে এসেছি। অনেকসময় ব্যাগে লাগানো প্লেনের লাগেজ ট্যাগ দেখে বুদ্ধিমান লোকেরা বুঝে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সেটাও হয়নি, কারণ ব্যাগে কোনো লাগেজ ট্যাগই লাগানো নেই।



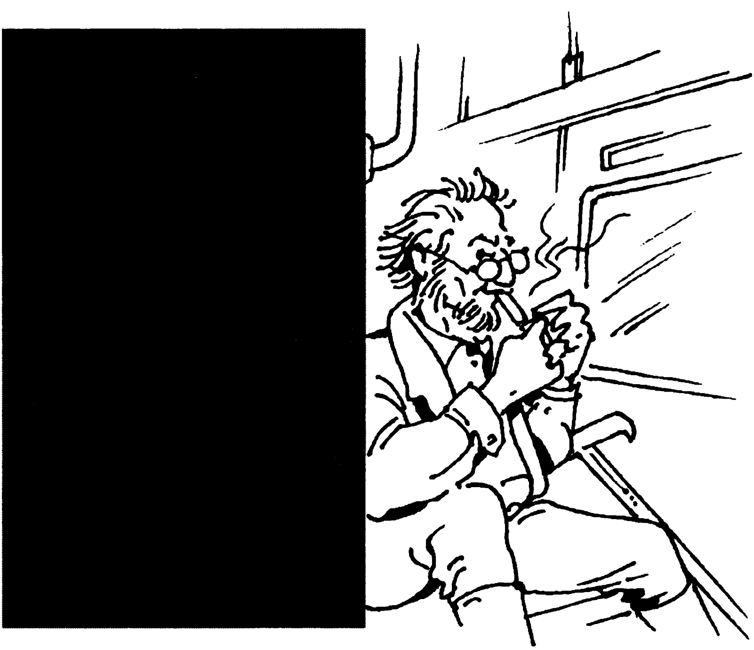
'নো স্মোকিং'-এর সাইনটা একবার আড়চোখে দেখে লোকটা মুচকি হেসে বেশ আয়েশ করে একটা চুরুট ধরাল। একটা বড়ো টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে উঠল—আমিই লুকা, তবে আমি আর ম্যাজিক দেখাই না, দেখালে তো তোমাকে স্টেজে তুলে বলতাম, এই যে, আমার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে আমি একটুও জানি না—চিনি না, কিন্তু সে কী ভাবছে তা আগে থেকে বলে দিতে পারি। এই যেমন—

আমিও নড়েচড়ে উঠলাম—বলুন তো আমি কী ভাবছি?

—ভাবছ, এই বুড়োটা হঠাৎ ভূতের মতো কোথা থেকে এল?—তাই না? তার আগে ভাবছিলে যে এত রাতে রোমা টার্মিনিতে পৌঁছে কোনো বিপদে পড়বে কি না।

একটু থেমে লুকা আমার মুখের চেহারা দেখে খুব জোরে হেসে উঠল—কি? ঠিক বলেছি?

আমাকে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাতে দেখে লুকা ফের বলে উঠল—এই রোমের রাস্তায় রাস্তায় প্রথমে ম্যাজিক দেখাতাম। তারপর



একটু নাম হল। লোকে বুঝল যে আমি ঠিক সাধারণ ম্যাজিশিয়ান নই। নাম ছড়িয়ে পড়ল। বড়ো বড়ো স্টেজে শো করতে লাগলাম। আমি খুব সহজে কাবুর মনের কথা বুঝে নিতে পারতাম। তার মনকে কন্ট্রোল করতে পারতাম। যেকোনো দশজন। তাদের নাম জিজ্ঞাসা করতাম এক এক করে। তারা নিজের নামও মনে করতে পারত না। ম্যাজিক শোয়ে কার সঙ্গে এসেছে তা-ও বলতে পারত না। আমার হাতের পুতুলের মতো ওদের নিয়ন্ত্রণ করতাম আমি। দর্শকদের হাততালিতে কান পাতা যেত না।

আমার সব থেকে স্পেশাল শো ছিল, 'ব্যাক টু লাইফ'। দর্শকদের মধ্যে থেকে যেকোনো একজনকে নিয়ে আসতাম স্টেজে। তারপর একটা টেবিলের ওপরে শুইয়ে দিয়ে লাঠি স্পর্শ করে ম্যাজিকের মাধ্যমে তার হৃদস্পন্দন থামিয়ে দিতাম। পালস রেট জিরো করে দিতাম। একজন ডাক্তারকে দেখিয়ে প্রমাণ করে দিতাম যে ওই দর্শক ক্লিনিকালি মৃত। পুরো হলে তখন পিনড্রপ সাইলেন্স। তারপর আবার প্রাণ ফিরিয়ে আনতাম। ওহ, তখন যে কী চিৎকার হত কী বলব! লোকে দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিয়ে যেত কয়েক মিনিট ধরে। এখনও চোখ বন্ধ করলে দৃশ্যগুলো চোখে ভেসে ওঠে। অনেক সময়, যাকে বাঁচিয়ে তুলতাম, তার প্রিয়জনেরা আনন্দে কেঁদে ফেলত। আসলে আমরা সবাই প্রিয়জনকে হারালে বুঝতে পারি যে তাকে কত ভালোবাসি।

একটু থামল বৃদ্ধ। চুরুটের বাকি অংশটা বন্ধ কাচের জানালার দিকে ছুড়ে ফেলে গলা খাঁকরে আবার শুরু করল—তা যত জনপ্রিয় হচ্ছিলাম, সমালোচনাও তত বাড়ছিল। কেউ বলছিল এগুলো নাকি লোক ঠকানো বুজরুকি। কেউ-বা এর সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে সরব হচ্ছিল। কী হবে যদি খারাপ লোকেরা এসব ম্যাজিক শিখে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে। তবে এসব সমালোচনা আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। এসব খ্যাতিরই অঙ্গ।

কিন্তু, অসুবিধে হল অন্য জায়গায়। কেউ কেউ আমাকে ভগবান ভাবতে শুরু করে দিল। ফ্রান্সিসকো সেরকমই একজন। একদিন একটা শো-এর পরে শুনি একটা লোক তার ছেলেকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। খুব নাকি আর্জেন্ট। বোঝো! আমার তখন নিশ্বাস ফেলার সময় নেই, আর কোথাকার কোন উটকো লোক নাকি আমার সঙ্গে

আর্জেন্টলি দেখা করতে চায়। আমি সেদিন দেখা করিনি। সারাদিন বসে থেকে লোকটা ফিরে যায়।

দু-দিন বাদে জেনুয়াতে। বিবরণ শুনে বুঝলাম, সেই একই লোক দেখা করতে এসেছে আমার সঙ্গে। সেবারও দেখা করিনি। এর দু-দিন বাদে মিলানে শো-এর পর সেই একই লোক। আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

এ তো নাছোড়বান্দা লোক! ভাবলাম দেখা করে বেশ দু-এক কথা শুনিয়ে দেব। বলে দেব যে, আমার মতো ম্যাজিশিয়ান চট করে স্টেজের বাইরে কারুর সঙ্গে দেখা করে না। লোকটাকে ভেতরে নিয়ে আসার নির্দেশ পাঠালাম। দু-মিনিট বাদে একটা রোগা ক্ষয়াটে চেহারার লোক ঘরে ঢুকল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দেখেই মনে হয় অবস্থা খুব খারাপ। গায়ের লংকোটে বোঁটকা গন্ধ। জুতোর সামনের দিকে সেলাই। হাতে রং-চটা সস্তার ঘড়ি। সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে। বয়স বোঝা মুশকিল। গ্রোথ হয়নি একেবারে, হাত-পাগুলো খুব রোগা রোগা। মুখটা খানিকটা বাঁদরের মতো। দেখেই মনে হয় খুব বড়ো কোনো অসুখ হয়েছে।

আমি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই লোকটা বসে পড়ে আমার দামি জুতোটা জাপটে ধরে বলে ওঠে—আমার ছেলেকে বাঁচান লুকা। সব ডাক্তার ওকে জবাব দিয়ে দিয়েছে। বলছে, আর তিন মাস মাত্র ওর আয়ু। কিন্তু ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আপনি হলেন ঈশ্বর। আপনি চাইলে সবকিছু করতে পারেন। আপনি ওকে বাঁচিয়ে দিন।

বলে লোকটা হাতের রং-চটা ঘড়িটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল—আমার টাকা নেই, আপনি এ ঘড়িটা রাখুন।

আমার যা অবস্থা, তাতে ওরকম একটা ঘড়ি আমাকে অফার করাটা কতটা হাস্যকর তা নিশ্চয়ই বলতে হবে না। তবু হাসতে পারলাম না ছেলেটার দিকে তাকিয়ে। ছেলেটার চোখে যেন কী একটা বিস্ময়, যেন আমি সত্যিই ঈশ্বর। যেন সত্যিই ওকে আমি সারিয়ে তুলতে পারি। বাঁকা পা দুটো দিয়ে লেংচে লেংচে একটু কাছে এগিয়ে এসে ওর বাবার পাশে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। যেন আমার একটা হ্যাঁ-ই ওকে ওর জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে।

আমার মাথার ঠিক ছিল না। আসলে অসম্ভবকে সম্ভব করে করে, হাজার লোকের হাততালি পেয়ে পেয়ে আমার নিজের ওপরেও এমন একটা আস্থা—এমন এক আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল যে, মনে হল সত্যিই আমি পারব। আমি পারব অসম্ভবকে সম্ভব করতে। জীবনে প্রথমবার আবেগে ভেসে গিয়ে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলাম। বললাম, আমি ওকে সারিয়ে তুলব।

ছেলেটার কী অসুখ তা আমি জানতাম না। কথাও বলতে পারত না ছেলেটা। 'আঁ-আঁ—আঁক', করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করত শুধু। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই বুঝলাম, ওর বাবার মতো ওরও বদ্ধমূল ধারণা যে, আমি বুঝি সত্যিই ওকে সারিয়ে তুলতে পারব।

আমার নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না। এক মাস পেরিয়ে যেতেই বুঝলাম যে, ছেলেটার অবস্থার কিছুই উন্নতি হচ্ছে না। অথচ আমি সত্যিই ওকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি। এতটাই যে, ম্যাজিক শো কমিয়ে দিয়ে ওর সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতে লাগলাম। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারতাম—কোনোরকম বাক্যবিনিময় ছাড়াই। ও কী ভাবছে, কী বলতে চাইছে—সব বুঝতে পারতাম। এমনকী ওর মনকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম। আর এর জন্য তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিল আমাকে। আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাইত না। আমি ওকে যতটা ভালোবাসতাম, ও বোধ হয় আমাকে তার থেকেও বেশি ভালোবাসত।

আমার স্পেশাল ক্ষমতার সবটুকু উজাড় করে দিয়েছিলাম ছেলেটাকে, ও অনেক হাসিখুশি থাকত, আমার সঙ্গে খেলত, আমার ম্যাজিক দেখত। কিন্তু মৃত্যু তবু একই ভাবে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। দু-মাসের মধ্যে আমার সব এক্সপেরিমেন্টকে হারিয়ে দিয়ে মৃত্যু ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লুকা। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে।

মিনিটখানেক বাদে আবার লুকা শুরু করল।

—ঘটনাটা আমাকে এতটাই অভিভূত করেছিল যে, আমি ম্যাজিক দেখানো বন্ধ করে দিলাম। আমার সমালোচকরা এই ব্যাপারটাকে কাজে লাগাল। ছেলেটাকে সারিয়ে তোলার নাম করে আমি ভুল চিন্তাভাবনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি।—এসব বলে ওরা আগেই আমাকে আক্রমণ শুরু করেছিল।

ওদের মতে, ম্যাজিক কখনো ডাক্তারির জায়গা নিতে পারে না। কিন্তু ওরা এটুকু বোঝেনি যে, ওকে সুস্থ করতে আমি ম্যাজিকের আশ্রয় নিইনি। আশ্রয় নিয়েছিলাম ভালোবাসার, গভীরভাবে ভালোবাসার। কিন্তু শুধুমাত্র ভালোবাসা দিয়ে কি মৃত্যুকে ঠেকানো যায়?

এর মধ্যে ইতালি গভর্নমেন্ট আমার ম্যাজিক শো-এর ওপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করল। চার্চেরও নানান বিরোধিতার মুখোমুখি হলাম। এখানে একজনের খুব সক্রিয় ভূমিকা ছিল। নাম—বোলে। সে তো রীতিমতো প্রমাণই করে দিল যে, আমার ম্যাজিকের জন্য লোকের মনে কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস বাড়ছে। তার প্রমাণ ওই ছেলেটার অকাল মৃত্যু। আমিও আর ম্যাজিকে আগ্রহ পাচ্ছিলাম না। মনে হত কী হবে শুধু মজার জন্য ম্যাজিক দেখিয়ে। যেখানে দরকার ছিল সেখানেই তো হেরে গেছি। ম্যাজিক দেখানো প্রায় বন্ধই করে দিলাম। আস্তে আস্তে লুকাকে লোকে ভুলে গেল। বিশ্বের সেরা ম্যাজিশিয়ানকে ভুলে গেল।

লুকা প্রায় বিড়বিড় করে শেষের কথাগুলো বলল। যেন আর শ্রোতার দরকার নেই। ওই বক্তা—ওই শ্রোতা।

আমি দমবন্ধ পরিবেশটা কাটানোর জন্য প্রশ্ন করলাম—তা আপনি এখন কী করেন? এখন আর ম্যাজিক দেখান না?

—চাইলেই কি আর ম্যাজিক না দেখিয়ে থাকা যায়? ম্যাজিক যে রক্তে। মৃত্যুর পরেও ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিশিয়ানই থাকে।

শেষের কথাটার অর্থ খোঁজার চেষ্টা না করে কথোপকথনকে আবার যেন লাইনে নিয়ে আসার জন্য বললাম—আচ্ছা, ট্রেন কি আর ছাড়বে না? রাত একটা বাজতে চলল।

লুকা হঠাৎ আমার দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে ধরল। খবরের কাগজ। কিন্তু পুরোনো—এত পুরোনো যে পাতাগুলো লালচে হয়ে গেছে। ইতালিয়ানে লেখা। আমি ওর কী বুঝব?

লুকার বোধ হয় এতক্ষণে খেয়াল হল। কাগজের একটা আর্টিকেল দেখিয়ে লুকা বলে উঠল—খবরটা কী জানো? খবরটা হল লুকা বলেছে যে, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ রোমের পথে একটা বড়ো ট্রেন দুর্ঘটনা হবে। ব্রিজ ভেঙে ট্রেন পড়ে যাবে।

—১৯ ফেব্রুয়ারি? সে তো আজকেই, তা—

লুকা বলে—এই খবরটা যে পেপারটাতে বেরিয়েছে তার ডেটটা দেখলে না? ইংরেজিতে লেখা। পড়ে বলো তো কোন ডেট।

—১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮। চোখ বুলিয়ে বললাম।

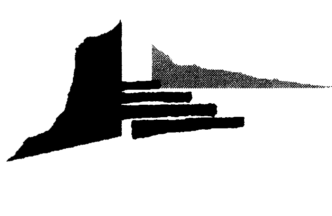
এতক্ষণে লুকা আবার আগের মুডে ফিরে এল।—৪৪ বছর আগে বলে দিয়েছিলাম এই দুর্ঘটনার কথা। তখন আমি থাকতাম সব খবরের শিরোনামে। আমি যা বলতাম তা হেডলাইন হয়ে যেত। এই খবরটাই বেরিয়েছিল। কাল যখন সাংবাদিকেরা আসবে, এই কাগজটা দেখিয়ো। ওদেরও মনে পড়ে যাবে লুকাকে। এই কামরা আর পরের তিনটে কামরা শুধু বেঁচে গেছে। বাকি কামরাগুলো এখন ব্রিজ ভেঙে ঝুলছে বা নদীতে পড়ে গেছে। তুমি খুব লাকি বুঝলে? কোনোরকমে বেঁচে গেছ। আর একটু হলে এটাও যেত।

খানিক বাদে অনেক সাংবাদিক ঘিরে ধরবে তোমাকে। তখন মনে করিয়ে দিয়ো যে লুকা এই কথাটা অনেক আগেই বলে দিয়েছিল। চার যুগ পরে আমি আবার খবরের কাগজের হেডলাইনে ফিরে আসব। লোকে আর ভাববে না যে লুকা লোক ঠকাত।

—তা সে তো আপনিও বলতে পারেন। আমার থেকে আপনার বলাই তো ভালো।

লুকা উঠে দাঁড়িয়ে পাশে রাখা লাঠিটা হাতে তুলে নিল। তারপর দরজার দিকে যেতে যেতে বলে উঠল—লুকা সুইসাইড করেছিল ১৯৬৮-র ২০ ফেব্রুয়ারি। ৪৪ বছর আগে। দুঃখ-অপমান আর সহ্য করতে না পেরে। ওই প্রেডিকশানটার ঠিক পরের দিন।

লুকার শরীর আর কণ্ঠস্বর দুটোই পরমুহূর্তে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।



লোকটার ডান হাতটা ছোটো

সুন্দরবনের ছোটো একটা খাড়ি ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। বড়ো নদী বিদ্যাধরী। স্থানীয় লোকেরা নানান জায়গায় নানান নাম দিয়েছে। সুন্দরখালি, নেতিখালি, চোরাখালি আরও কত কী! এর থেকে শিরা-উপশিরার মতো বেরিয়ে গেছে অজস্র খাড়ি।

তারই মধ্যে ঘুরছি আমরা। খাড়ির দু-দিকে ঘন হেতালের বন। তার খেজুরের মতো হলুদ-সবুজ লম্বা পাতায় কেমন যেন গা ছমছম ভাব। আর আছে মাঝে মাঝে সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া, বাইন। গরানের চারদিক থেকে নেমেছে ঠেসমূল। এরাই এ জঙ্গালের জমিদার—চেয়ারে যেন গা হেলিয়ে বসে আছে।

খাড়ির ভেতরে ঢুকলেই মনে হয় এই বুঝি বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল। খাড়ি থেকে বেরোলেই মনে হয়—কই দেখা পেলাম না তো! আবার আরেক খাড়িতে ঢুকি। ফের খানিকক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে ঘোরা। এরই মাঝে নদীতে জল বাড়ছে। জোয়ার আসছে। শুধু কয়েকটা গাছের ডাল জলের থেকে বেরিয়ে আছে। চরের কিনারায় মিনিমাছ ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে মাছরাঙা জলে ছোঁ মারছে। এ সবের মধ্যেই পাশে বসা বব থেকে থেকেই বলে উঠছে, ইটস অসাম। ওয়ান্ডারফুল।

আমরা সোনাখালি অবধি এসেছি গাড়িতে। সোনাখালি থেকে একটা ছোটো লঞ্চ তিন দিনের জন্য ভাড়া নিয়েছি। বেশ সাজানো-গোছানো।

যাত্রী দু-জন। কিন্তু তাদের সামলাতে আরও ছ-জন। দু-জন বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। দু-জন রান্নায় ব্যস্ত। আর দু-জন মাঝি। এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, সেখানে বোধ হয় কিছু লোকের বাস আছে। নদীর ধারে কয়েকটা বাচ্চা আমাদের লঞ্চের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ববই আমার মনের কথাটা বলে উঠল। এখানে ওর একবার নামার ইচ্ছে। লগি দিয়ে ঠেলে নৌকো ধারে নিয়ে আসা হল। ববের তড়বড়ানি একটু বেশি। লঞ্চ থেকে লাফিয়ে যেভাবে নামল, যেন লং জাম্প প্রতিযোগিতায় নেমেছে। কিন্তু নরম এঁটেল মাটি সে অত্যাচার সহ্য করবে কী করে! প্রায় পুরো পা কাদায় ঢুকে গেল। অনেক কষ্টে ওকে টেনে তোলা হল। কয়েকটা বাচ্চা ইতিমধ্যে লঞ্চ ঘিরে ধরেছে। ওদের সঙ্গে আমি আর বব গ্রামের ভেতরের দিকে এগোলাম।

খানিক বাদে গ্রামের মোড়লের সঙ্গে দেখা হল। মোড়ল আমাদের সঙ্গে আলাপ করে দারুণ খুশি। আমার থেকেও ববের সঙ্গে আলাপে আগ্রহ বেশি। মাঝেমধ্যে মোড়ল গ্রামের বাকিদের বেশ শুনিয়ে শুনিয়ে দু-একটা ইংরেজি বলছিল। বব বা আমি তার কিছু না বুঝলেও গ্রামের আর পাঁচটা লোকের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তারা বুঝছে। বেশ একটা গর্বের দৃষ্টিতে মোড়লকে দেখছে। কথায় কথায় আমার আঁকার কথা উঠল। আমি আঁকি শুনে মোড়ল ওই গ্রামেরই একজনের কথা বলে উঠল। সেও নাকি দারুণ আঁকত। কাজকর্ম কিছুই করত না, শুধুই ছবি আঁকত। নাম দীপেন মণ্ডল। বছর কুড়ি আগে মারা গেছে। কৌতূহল হল যেখানে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর ফারাক এত কম, সেখানে একজন কেমন করে আঁকে? ওর আঁকা ছবি দেখতে চাইলাম। দু-জন লোক আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে চলল ওর বাড়ি দেখাতে। খানিক বাদে একটা মাটির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সামনে শক্ত মাটির দাওয়া। ওখানে বসে মুড়ি আর বাতাসা খেতে খেতে ওর আঁকা ছবি দেখতে থাকলাম। আঁকার হাত সত্যিই অদ্ভুত। প্রত্যেকটা ছবিতেই রঙের আশ্চর্য ব্যবহার। কোনোটাই ঠিক স্বাভাবিক রং নয়। কিন্তু সে রঙে ছবির ভাষা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সব থেকে ভালো লাগল একটা বাচ্চা ছেলের ছবি। ছোটো কাপড় জড়িয়ে পরা, খালি গা। একটা গাছে হাত দিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত জীবন্ত সে

ছবি। কীসের ওপর আঁকা কে জানে। মনে হল কোনো গাছের বড়ো পাতার। লম্বায় প্রায় তিন ফুট। চওড়া ফুট দুয়েক হবে।

জিজ্ঞেস করে জানলাম, বুড়োর ছিল এক নাতি। আর আপন বলতে কেউ ছিল না। ও-ই ছিল বুড়োর প্রাণ। বুড়ো বিশেষ চলতে ফিরতে পারত না। তার ওপর মাঝেমধ্যে অজ্ঞান হয়ে যেত। কেন কে জানে! ওর ছিল এই ছবি আঁকা আর পুতুল গড়ার নেশা। দিনরাত দালানে বসে এঁকে যেত। অবশ্য সেসব ছবি কখনোই এ গ্রামের সীমানা পেরোত না। হঠাৎ একদিন ওর নাতি মধু আনতে গিয়ে আর ফিরল না। বোধ হয় বাঘে খেয়েছিল। বুড়ো পাগলের মতো হয়ে গেল।

নাতির শোকে দিনরাত চুপ করে বসে থাকত। কথা বলত না। এরপর মাসখানেক বেঁচে ছিল। তুলি আর এই ছবিটা নিয়ে বসে থাকত। আর বলত, দেখো, মনু আমার ঠিক ফিরে আসবে। এই ছবিই ওকে ফিরিয়ে আনবে। চাঁদের আলোয় ছবিটা মেলে ধরে দেখত ঠিক নাতির মতো হয়েছে কি না। এসেছে কি না ওর মোটা ভুরুটা। ওর নীলচে চোখ দুটো, ওর থুতনির আঁচিলটা, ওর ছোটো ডান হাতটা। সঙ্গী গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানলাম সত্যিই ওর নাতিকে দেখতে ছিল হুবহু ওই ছবির মতো। তারও নাকি বুড়োর মতো হঠাৎ হঠাৎ করে অজ্ঞান হওয়ার ব্যামো ছিল। ঘটনার মাসখানেক পরে দীপেন মণ্ডল মারা যায়। মৃত্যুশয্যায় পাশে ছিল এই ছবি।

আমি ছবিটা কেনার প্রস্তাব দিলাম। যারা আমাদেরকে দেখাতে নিয়ে এসেছিল তারা ওই ছবিটা ছাড়া অন্য যেকোনো ছবি দিতেই রাজি ছিল। কিন্তু আমার আবার জেদ। ওটাই চাই। পাঁচ-শো টাকার একটা নোট ধরাতে মৃদু প্রতিবাদ করে ছবিটা আমার হাতে তুলে দিল ওরা। বললাম সবাইকে ওঁর আঁকা ছবি দেখানোর জন্যই কিনছি।

আমার অবশ্য ইচ্ছে ছিল অন্যরকম। সেটা জানানোর আগে আমার পরিচয় দেওয়াটা দরকারি। আমি দেশের এখনকার অন্যতম নামকরা চিত্রকর। আমার এক-একটা ছবি দেশ-বিদেশে লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়। তবু এ ছবি দেখে কেন জানি না, আমার মনে হল এ আঁকা অন্যরকম। আমার পক্ষে এরকম আঁকা সম্ভব নয়। তাই ইচ্ছে ছিল এ ছবিটা আমার



নামে চালিয়ে দেওয়ার। সামনেই কয়েকদিন বাদে আমার একটা আর্ট এগ্‌জিবিশন আছে। তাতে এ ছবিটা রাখতে পারলে দারুণ হবে। মনের মধ্যে অবশ্য কে যেন খোঁচা দিচ্ছিল—না, এটা ঠিক হচ্ছে না। আমার মতো বড়ো চিত্রকরের এরকম করা উচিত নয়। নামডাকের থেকে নতুন কিছু তৈরির আনন্দই সবার আগে। আবার মনের মধ্যে যে মানুষটা এতদিন শিল্পী বলে নিজের পরিচয় দেয়, সে বলে উঠল ছবিটা অনায়াসে আমার নামে চালানো যায়। বব তো থাকে সুদূর আমেরিকায়। আর এই জনা কুড়ি



গ্রামবাসী। আগামীকাল কী হবে তা নিয়েই এরা ভাবে না। অরূপ নন্দীর আর্ট এগ্‌জিবিশন এদের পথে কোনোদিন পড়বে না। মাছ ধরা, কাঠ বিক্রি, মধু সংগ্রহ আর বেঁচে থাকা—ব্যাস, এর বাইরে আর কোনো কিছুতে এদের আগ্রহ নেই। তাই ধরা পড়বার ভয়ও নেই।

আরও কিছুক্ষণ গ্রামে ঘুরে লঞ্চে এসে উঠলাম। আরও দু-দিন বাদে সল্টলেকের বাড়িতে আমার স্টুডিয়োতে ছবিটার মুখোমুখি হলাম। সত্যিই অসাধারণ! তবে আমার নামে চালানোর আগে কিছু পরিবর্তন করা

দরকার, যাতে লোকের সন্দেহ না হয়। চোখের তলায় শেডটা দিলে ভালো লাগবে। গাছের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে একদিকের ফেসটা যতটা উজ্জ্বল লাগবে সূর্যের আলোয়, অন্যদিকটা ততটা নয়। ছেলেটার ডান হাতটা যদি ছোটো না হয়, তাহলে আরও ভালো লাগবে। হাতটা স্বাভাবিক হলে, সে হাতটা গিয়ে গাছ জড়িয়ে থাকলে সেটা অনেক ভালো দেখতে হবে। একেই বলে ছবির পূর্ণতা। ছবির এই অংশগুলো একটু চেঞ্জ করলে অসাধারণ হয়ে উঠবে। এসব আঁকতে আঁকতে রাত বারোটা হয়ে গেল। দারুণ লাগছে। আমার আঁকার স্টাইলের কিছু ছাপ ফুটে উঠেছে ছবিটায়। আর দু-দিন বাদে আমার আর্ট এগ্‌জিবিশনে এ ছবিটা স্থান পাবে, সবাই প্রশংসা করবে—এসব কথা ভেবে আনন্দে সে রাতে ভালো ঘুম হল না। মনের গভীরের শিল্পী ফের বলে উঠল—কেউ জানবে না।

পরদিন আমার ছবি প্রদর্শনীর আয়োজক প্রসূনবাবুকে ছবিগুলো দেখালাম। উনি নিজে ভালো ছবির সমঝদার। আমার বিভিন্ন অয়েল পেন্টিংগুলো উনি দেখলেন, সঙ্গে এটাও। ওঁর মতে দুটো ছবি অসাধারণ। একটা শীত এড়াতে কয়েকজনের আগুন পোহানোর দৃশ্য, অন্যটা ওই ছবিটা। উনি যখন আবার দেখছেন, তখন হঠাৎ খেয়াল হল—আরে, কোথায় গেল ওর চোখের নীচের শেড! কোথায়ই বা ছেলেটার ডান দিকের সেই হাতটা যেটা স্বাভাবিক করে এঁকেছিলাম। ছবিটা ফিরে এসেছে ঠিক আগের অবস্থাতে। একটা অস্ফুট শব্দ বোধ হয় আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। প্রসূনবাবু বললেন—কী ব্যাপার? কিছু বলবেন? প্রসঙ্গটা আমি কোনোরকমে এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু এত অবাক আমি জীবনে হইনি। এত বড়ো ভুল! স্পষ্ট মনে আছে চোখের তলায় শেড দিলাম। হাতটা স্বাভাবিক করে দিলাম। কিন্তু তাহলে এটা কী করে সম্ভব হয়? সব স্পিরিটের মতো উবে গেল? হতবাক হয়ে বসে আছি, প্রসূনবাবু বললেন—এটা তো ঠিক সাধারণ অয়েল পেন্টিং বলে মনে হয় না। এ ছবিটার মধ্যে রংই বলুন আর আঁকার স্টাইলই বলুন, দুই-ই নতুন ধরনের। দেখবেন এ ছবিটা কীরকম আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

আরও বেশ কিছু বিশেষণ উনি ব্যবহার করেছিলেন। তবে তখন আর আমার তা শোনার অবস্থা ছিল না। কোনোরকমে প্রসঙ্গ পরিবর্তন

করলাম। আরও এ কথা সে কথা বলার পর প্রসূনবাবু চলে গেলেন। আমি ওই ছবিটা নিয়ে হাজির হলাম স্টুডিয়োতে। বোর্ডে ফেলে তুলির ছোঁয়া লাগাতে থাকলাম। প্রায় দেড় ঘন্টা বাদে যখন ছবি ছেড়ে উঠলাম তখন আমি বেশ স্যাটিসফায়েড। বেশ ফুটেছে রংগুলো। দেখে বোঝাই যাচ্ছে না যে, এটা আরেকজনের ছবির উপরে আমার আঁকা। বাচ্চাটাকেও বেশ দেখাচ্ছে হাতটাকে স্বাভাবিক করার পর থেকে। এটা আমার অন্যতম সেরা আঁকার মধ্যে থাকবে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই চলে এলাম স্টুডিয়োতে। দিনের আলোয় দেখা যাক কেমন দাঁড়িয়েছে ছবিটা। ঘরে ঢুকে জানলার পর্দা সরাতেই একরাশ আলো ছড়িয়ে পড়ল ছবিটার ওপরে। কিন্তু এ কী? কোথায় গেল আমার আঁকা অংশটুকু? এ তো সেই একই ছবি যা নিয়ে এসেছিলাম সুন্দরবন থেকে। অবিকল একইরকম। আমার আঁকার একবিন্দুও কোথাও নেই। সেই কুৎসিত ডান হাতটা ফের ছোটো হয়ে গেছে। জামার হাতার থেকে একটু বেরিয়ে আছে। ছবিটা ভূতুড়ে নাকি! কেউ যেন বারবার এসে আমার আঁকা অংশটুকু মুছে দিয়ে যাচ্ছে।

জেদ চাপল। আমার মতো আর্টিস্টের আঁকায় হাত চালানো! সেদিন কয়েকটা অনুষ্ঠান, প্রেস কনফারেন্স, টিভি চ্যানেলে আলোচনাসভা—এসব ছিল। সারাটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। তবু সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ঘুরছিল ওই একই চিন্তা। চিরকালই আমি একরোখা বলে পরিচিত। যা মাথায় চাপে তা করেই ছাড়ি। আজও অন্য রাতের মতো আঁকতে বসলাম স্টুডিয়োতে। কাল প্রদর্শনী চালু হচ্ছে। আজকে এ ছবিটা চেঞ্জ করতেই হবে। ইতিমধ্যে মাথায় আরও কয়েকটা আইডিয়া এসেছে। সেগুলো করতে পারলে আরও ভালো হয়। যেমন—ছেলেটার চোখের পাশে একটা কাটা দাগ দিলে ভালোই হবে। গ্রামের ছেলে। অনেক কম বয়স থেকেই স্ট্রাগল করতে হয়। কাটা দাগটা থাকলে মুখে এই ভাবটা বেশ ফুটে উঠবে। গাছের নীচে ঝোপটারও একটু পরিবর্তন দরকার। মনের সুখে তুলির আঁচড় দিতে লাগলাম। ঘন্টা দুয়েক বাদে আঁকা শেষ হল। আজ আমি আর ছবির সামনে থেকে সরছি না। দেখি কেমন করে এই ছবি আগের অবস্থায় ফিরে আসে। ঘরের নাইট ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে জানালার দিকে মুখ করে

বসে রইলাম। মাঝেমধ্যে আড়চোখে তাকাচ্ছিলাম ছবির দিকে। ঘড়ির কাঁটা রাত একটায় পৌঁছোল। শনশন আওয়াজ করে ফ্যানটা চলছে। সামনের গাছ থেকে পাখির পাখা ঝটপটানির শব্দ আসছে। আর শুনতে পাচ্ছি নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। এতই নিস্তব্ধ চারদিক। বাইরে অমাবস্যার অন্ধকার। হঠাৎ কার যেন পায়ের শব্দ পেলাম ঘরে। একটা বাচ্চার কান্নার শব্দ।

ঘরের মধ্যে থেকেই আসছে। কোথায়? ছবির দিকে চোখ পড়ল। ছবির গভীরতা যেন বেড়ে যাচ্ছে। আমার এক ইঞ্চি পুরু ক্যানভাস এখন অন্তত আধ ফুট। স্পষ্ট হয়ে উঠছে ছেলেটার চোখ, নাক, কান। স্পষ্ট হয়ে উঠছে ছোট্ট ডান হাতটা। গায়ে রং-চটা সস্তার শার্ট। খালি পা। কালো রং। কোঁকড়ানো চুল। গাছে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। স্পষ্ট অনুভব করছি নিশ্বাসের স্পর্শ। আস্তে আস্তে ও ছবির থেকে বেরিয়ে এল। চোখটা যেন ছলছল করছে। ঘরময় ঘুরে বেড়াতে থাকল। ঘরের প্রত্যেকটা জিনিসে ওর আগ্রহ। তুলি, রং, প্যালেট, আমার অয়েল পেন্টিং-এর ক্যানভাস, বইয়ের আলমারি, হোম থিয়েটার সিস্টেম সবকিছু ঘাঁটতে থাকল। ভয় ও বিস্ময় আমাকে এতটাই বিবশ করে দিয়েছে যে চেয়ারের হাতল থেকে হাতটাও নড়াতে পারছি না। খানিক বাদে ও আমার পাশে এসে দাঁড়াল। মনে হল ফিসফিসিয়ে কী যেন বলছে। ডান হাতটা তুলে বলছে—কাকু, চাইলেই কি আর আমাকে পালটে ফেলা যায়! আমি তো এরকমই।

হঠাৎ কানের কাছে 'বাবু' বলে কে যেন ডাকল। ফের ওই একই ডাক। চোখ খুলে দেখি পাশে গণেশ দাঁড়িয়ে। চা নিয়ে। ভোরের আলো ঘরের মধ্যে হানা দিয়েছে। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম। চোখ এবার পড়ল ছবিটার ওপর। আবার সেই আগের অবস্থায় ছবিটা ফিরে এসেছে। সেই ছোটো ডান হাত। চোখের পাশে কোনো কাটা দাগ নেই। অসহ্য! ফের হেরে গেলাম একজন সামান্য আর্টিস্টের কাছে? মনে হল ছুটে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলি ছবিটা। কিন্তু তাহলে আমার প্রদর্শনীর কী হবে। এ ছবিটা আমি দেব বলে রেখেছি। চুপ করে বসে ভাবতে থাকলাম। কালকের স্বপ্নটা যেন স্বপ্ন নয়। সত্যি ঘটনা। আর সত্যিই তো, ছবির থেকে আমার আঁকা অংশটুকু উবে যায় কী করে? ভূতুড়ে কাণ্ড ছাড়া কী-ই বা বলা যায়?

এসব ভাবছি, এমন সময় প্রসূনবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। —এ কী দাদা, এখনও এ ছবিটা পাঠাননি। এই তো আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার প্রদর্শনী চালু হয়ে যাবে। এত ভালো ছবিটা, দেবেন না!

চুপচাপ রইলাম। নেহাতই প্রসূনবাবুকে বলেছিলাম প্রদর্শনীতে এ ছবিটাও থাকবে, না হলে আমার এখন এ ছবি পাঠানোর কোনো ইচ্ছা নেই। ভূতুড়ে ছবি। কে জানে কখন কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ছবিটা পাঠিয়ে দিলাম। যা থাকে কপালে। সকালে প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন। নানান গণ্যমান্য লোকের সমাগম হয়েছে। অধিকাংশই আঁকার থেকে আমাকে ভালো বোঝে, ছবির সামনে দাঁড়িয়ে জানাতে চায় যে তাদেরও একটা শিল্পীমন আছে।

সকালে ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হল। কোনো রকমে বুড়ি ছুঁয়ে আসা। বিকেলের দিকে আরেকবার গেলাম। আমার অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া দেখতে। ঢুকতেই কয়েকজন আমাকে ঘিরে ধরল। অটোগ্রাফ। মোটামুটি ভিড় হচ্ছে। ঠিক সামনেই একটা মেলা চলছে। ওই ভিড়েরই একটা অংশ এ প্রদর্শনীও ঘুরে যাচ্ছে।

হঠাৎ ওই ছবিটার কথা মনে পড়ল। ছবিটার দিকে এগোতে গিয়ে দেখি ওই ছবির সামনে বেশ কিছু লোকের একটা জটলা। আমাকে দেখেই সবাই সরে দাঁড়াল। এবার প্রশ্নটা এল একজন কমবয়সি ভদ্রলোকের কাছ থেকে। বছর তিরিশেক বয়স হবে। —সত্যিই ছবিটা অসাধারণ। আপনি যে এভাবে একজন অনামি আর্টিস্টের আঁকাকে আপনার প্রদর্শনীতে স্থান দেবেন তা ভাবাই যায় না। সত্যি, আপনি মানুষ হিসেবেও খুব বড়ো। আচ্ছা, দীপেনবাবু যে লিখেছেন এটা একটা বিশেষ ধরনের পাতায় আঁকা—যার ওপর একবার আঁকলে নাকি আর আঁকা যায় না, তা আপনি কি ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী পাতা? তার ওপরে এঁকেছেনই বা কীভাবে?

কথাগুলো শুনে আমার মাথা যেন কেমন করে উঠল। পায়ের ওপরে দাঁড়ানোর জোর যেন হারিয়ে ফেলছি। কোনোরকমে ছবিটার দিকে তাকালাম। কোথায় লেখা? কোথাও তো কিছু লেখা নেই।

আমার মতো একই প্রশ্ন বোধ হয় পাশের একজনের মনেও এসেছিল। উনি ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—কোথায় লেখা?

উত্তর পেলেন—গাছের পাতাগুলো লক্ষ করুন।

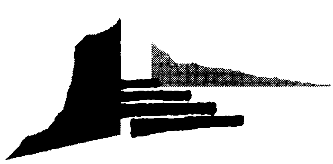
ভদ্রলোকের সঙ্গে আমিও দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়ে গাছের পাতার দিকে তাকালাম। মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল কতকগুলো লেখা, যা আগে আশ্চর্যভাবে চোখেই পড়েনি। গাছের কয়েকটা পাতা আসলে এক একটা অক্ষর। আঁকা আর লেখা এমনভাবে রঙের মধ্যে মিশে গেছে যে এমনি দেখলে চোখেই পড়ে না। তাতে লেখা—আমি এটা একটা বিশেষ ধরনের গাছের পাতায় এঁকেছি যাতে একবার আঁকা হয়ে গেলে আর নতুন কোনো রং না ফোটে। আমি চাই না আমার নাতির এ ছবি কেউ বিকৃত করুক—দীপেন মণ্ডল।

ভদ্রলোক বলে চলেছেন—দীপেনবাবুর নিশ্চয়ই টেম্পোরাল লোব এপিলেপ্সি ছিল। বিখ্যাত আর্টিস্ট ভিনসেন্ট ভ্যানগগ-এরও এই একই রোগ ছিল। এডগার অ্যালান পো, দস্তয়েভস্কি, লুই ক্যারল, এঁদের সবারই ছিল একই অসুখ। এঁরা সবকিছুই অন্যভাবে দেখতেন। তাই রঙের ব্যবহারও অন্যরকম হয়।

—আপনি কী করে জানলেন?—ধরা গলায় প্রশ্ন করি।

—আমি ডাক্তার। তা ছাড়া আমারও ওই একই রোগ আছে। তাই অতটা শিল্পমনস্ক না হলেও খানিকটা ধরে ফেলি।

আমি সপ্রশংস দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। অদ্ভুত নজর তো। কিন্তু তাকিয়েই চমকে উঠলাম। ভদ্রলোকের চোখের মণি নীলচে আর ডান হাত অস্বাভাবিকরকম ছোটো!



চাণক্য

কুনজনডিওর নামটা ভারি অদ্ভুত। আরও অদ্ভুত এখানকার আবহাওয়া। দুপুরের বাতাসে যেমন আগুনের হলকা, তেমনি সন্ধ্যে হতে-না-হতে বাতাসে হিমেল ছোঁয়া। অনিমেষ ঘরের বাইরে চেয়ারে বসে এসবই ভাবছিল।

রাস্তার উলটোদিকের একটা বাড়িতে খাটিয়ায় শিবকুমার শুয়ে আছে। কেমপ্লাস্ট বলে একটা কোম্পানির ড্রাইভার সে। খাটিয়ার পাশে চাতালে বসে তার স্ত্রী ও দুই মেয়ে। চাঁদের আলোয় বসে গল্প করছে। তারই পাশের বাড়িতে থাকে এম. এন. কৃষ্ণন। বাজির ব্যাবসা। ভেতরের ঘরে মেয়েকে পড়াচ্ছে।

এখানকার অধিকাংশই এরকম। সন্ধ্যে বেলায় সব কাজের পরে হালকা মেজাজে সবাই মিলে গল্পগুজব করে।

অনিমেষের সে উপায় নেই। এখানে এক বহুজাতিক সংস্থার সফ্টওয়্যার কমিশনিং ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ও কিছুদিন হল এসেছে।

সিস্কল—পুরো কথায়, সাদার্ন আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড। সিস্কলে নতুন যে ব্লাস্টফার্নেস চালু হতে চলেছে—তার পুরো সফ্টওয়্যারই অনিমেষের লেখা। তাই দিন নেই রাত নেই কাজ করে চলেছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই ব্লাস্টফার্নেস চালু করতে হবে। চেয়ারে হেলান দিয়ে ল্যাপটপে সফ্টওয়্যার দেখতে শুরু করে অনিমেষ। এখানে ওটাই ওর অবসর বিনোদন।

—কতয় পেলে?

প্রশ্নটা পাশ থেকে। প্রশ্নকর্তাকে দেখে চমকে ওঠে অনিমেষ। এখানকার সবার ধারণা অনিমেষের পাশের বাড়ির এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। তার ওপরে এরকম জায়গা, যেখানে তামিল ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শোনার কথা ভাবাই যায় না—সেখানে একেবারে বাংলা।

ধাক্কাটা সামলানোর আগেই ফের প্রশ্ন—ল্যাপটপটা কতয় কিনলে?

—এটা আমাদের কোম্পানির, ঠিক জানি না। তবে খুব সম্ভবত পঁচাত্তর হাজারের কাছেপিঠে। তা আপনি বাঙালি?

হ্যাঁ।—বলেই তড়বড়িয়ে উনি অনিমেষের বাড়ির গেট খুলে বেরিয়ে পাশের বাড়িতে ঢুকে গেলেন।

অদ্ভুত লোক তো। এখানে এরকম প্রত্যন্ত জায়গায় আরেকজন বাঙালির দেখা পাওয়াটা রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার। অথচ উনি আলাপ-পরিচয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখালেন না।

এখানে প্রায় দু-মাস হতে চলল অনিমেষের। কিন্তু পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলা এই প্রথম। অনিমেষ লক্ষ করেছে রোজ গভীর রাত অবধি পাশের বাড়িতে আলো জ্বলে। খুটখাট শব্দ হয়।

পাশের বাড়িতে ওই বৃদ্ধের সঙ্গে থাকে একজন কাজের লোক। তারও হাবভাব বাবুরই মতো।

নিতান্ত কৌতূহলী হয়ে ওই ভদ্রলোক সম্বন্ধে বাড়ির কাজের তামিল মেয়েটিকে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করেছিল। উত্তরে সে মাথার দিকে আঙুল দেখিয়ে মুচকি হেসে জানিয়েছে—'পাইত্তায়াম'। অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাগল। ওই একই উত্তর আরও কয়েকজনের কাছে পেয়েছে। তাই পাশের বাড়ির থেকে দূরে থাকাই ঠিক করেছিল অনিমেষ। কিন্তু আজকের ঘটনায় ফের আলাপ করতে মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পরের দিন অনিমেষের কাজ থেকে ফিরতে রাত আটটা। খানিক আগে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাইরে চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে অনিমেষের চোখ পড়ল পাশের বাড়ির দিকে। ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাথার পিছনে হাত দিয়ে চেয়ারে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন

ভাবছিলেন। আলাপ করার এর থেকে ভালো সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

ভালো একটা জামা গায়ে গলিয়ে পাশের বাড়িতে ঢুকতে যায় অনিমেষ। গেট ঠেলে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ প্রশ্ন—কাকে চাই?

উত্তর দেবার আগেই ভদ্রলোকের গলা পাওয়া গেল—কৃষ্ণ, বাবুকে আসতে দে। আরে, এসো এসো।

ভদ্রলোক চোখ বুজেই বলে ওঠেন। কৃষ্ণ ঘর থেকে আরেকটা চেয়ার বার করে দেয় অনিমেষকে।

—বসো। তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরো না। তুমি আমার নাতি বয়সি।

—তা আপনি একাই থাকেন?

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী প্রায় বছর পনেরো হল মারা গেছেন। চশমা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে ভদ্রলোক বলেন, ছেলেপিলে নেই। ওই আমি আর কৃষ্ণ। এমনিই আমার চাহিদা খুব কম, তাই এ জায়গায় চলে যায় আর কি! তা তুমি এখানে ক-দিন আছ?

—প্রায় মাস দুয়েক হতে চলল। আর দিন দশ-পনেরো। মনে হয় তার মধ্যেই কাজ শেষ করতে পারব।

—তুমি কোন কোম্পানিতে কাজ কর?

—সিমেন্স। আমি সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। এখানকার ব্লাস্টফার্নেসের প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলারের সফ্‌টওয়্যার আমারই লেখা। তা আপনি এখানে ক-দিন আছেন?

—বিশ বছর তিন মাস দু-দিন হল আজ নিয়ে। তার আগে মাদ্রাজ আই. আই. টি.-তে কম্পিউটার সায়েন্সের প্রফেসার ছিলাম।

—তাই নাকি! তা এখানে এলেন কেন?—অনিমেষের গলায় সম্ভ্রমের সুর।

—কারণটা আমি তোমাকে পরে বলব। আজ রাত এগারোটা নাগাদ এসো। একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাব তোমাকে।

রাত এগারোটায় একজন আধপাগলা লোকের সঙ্গে দেখা করতে আসাটা ঠিক হবে না, সেই চিন্তায় অনিমেষ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

প্রফেসার রীতিমতো প্রশ্নের সুরে বলে বসলেন—আচ্ছা বলো তো, বৃষ্টির জন্যে এই যে মাটি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাচ্ছ, এর কারণটা কী?

হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্নে মাটির গন্ধর থেকে পাগলামির গন্ধই বেশি পায় অনিমেষ। কয়েক সেকেন্ড পর বলে ওঠে—জানি না।

—জানা উচিত ছিল। এসব সাধারণ জিনিস না জানতে পারলে পড়াশোনা করে কী লাভ। ...মাটিতে স্ট্রেপটোমাইসেটিস (Streptomycetes) বলে একধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে। বৃষ্টির জলে ভিজে গেলে এরা জিয়োস্‌মিন (Geosmin) ও মিথাইল আইসোবোর্‌নিয়োল (Methyl Isoborneol) নামে দুটো যৌগ দেহ থেকে ছাড়ে। এই যৌগের জন্যই মাটি থেকে ওই সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়—বুঝলে।

হতবাক হয়ে অনিমেষ মাথা নাড়ে। উঠতে যাবে, কিন্তু ইতিমধ্যে মুড়ি আর বাদাম এসে পড়ায় বাধ্য হয়ে বসতে হয়। দূরের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বলে ওঠেন—কাল শ্রীহরিকোটা থেকে জিয়োসিন্‌ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল ছাড়বে। তাই খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছি। পুরোপুরি ভারতে তৈরি। কত গর্বের কথা তাই না!

ভদ্রলোকের আনন্দে চকচক করে ওঠা চোখের দিকে তাকিয়ে সম্মতি জানায় অনিমেষ। ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে হাঁটতে শুরু করেন—কয়েক বছর আগে রাশিয়ার কাছে হাত পাতছিল। পরে রাশিয়া দিতে রাজি না হওয়ায় পুরোপুরি নিজের প্রযুক্তিতেই তৈরি করেছে। কালকে ওদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব যে আমরা নিজেরাও পারি।

—কিন্তু কাল পারবে তো? বেশির ভাগ স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেলই তো ঠিকমতো কাজ করে না।

সামনের টেবিলের ওপর ঘুসি মেরে অনিমেষের চায়ের কাপ উলটে ভদ্রলোক বলে ওঠেন—আমাদের এটাই দোষ। আমরা নিজেদের ওপর ভরসা রাখতে পারি না। আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যাপারেই দেখো না! তুমি জান, আলট্রাসোনোগ্রাফি কীভাবে কাজ করে?

সামান্য মুড়ি খেতে গিয়ে এতটা বিপদে পড়তে হবে ভাবতে পারেনি অনিমেষ। কোনোরকমে মান রক্ষা করতে বলে ওঠে—খুব উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দের সাহায্যে দেহের ভেতরের ছবি তোলা হয়।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। খুব উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ শরীরের কোনো অংশের উপর ফেলা হয়। কোনো জায়গায় পেশীর ঘনত্বের সামান্য পরিবর্তন হলেই সেখানে শব্দ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। এই প্রতিধ্বনির সাহায্যে হৃৎপিণ্ড, লিভার, কিডনি প্রভৃতির ছবি পাওয়া গেলেও ছোটো রক্তকোষের ছবি তোলা যায় না। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে মাদ্রাজ আই.আই.টি.-র একজন প্রফেসার বলেছিল ডপ্‌লার এফেক্টের সাহায্যে তাও সম্ভব। —ডপ্‌লার এফেক্ট কী, জান তো?

—হ্যাঁ, শ্রোতা আর শব্দের উৎসের আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভর করে শব্দের কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়। যদি শ্রোতা উৎসের দিকে এগোয়, শব্দের কম্পাঙ্ক শ্রোতার কাছে বেড়ে যায়। উলটোদিকে হলে কমে যায়।

বাঃ—বলে চেয়ারটাকে আরও অনিমেষের দিকে টেনে এনে ভদ্রলোক বলে ওঠেন—হ্যাঁ, ঠিক একইভাবে শব্দের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে রক্তপ্রবাহ বোঝা যায়। রক্তের দিকে একটা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের শব্দ পাঠালে রক্তের গতির ওপর নির্ভর করে কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়। তাই কালার প্রসেসারের মধ্যে দিয়ে এই সংকেত পাঠালে কম্পাঙ্ক বাড়া বা কমার উপর নির্ভর করে লাল ও নীল রঙের শ্রেণি পাওয়া যায়। লাল রং দেখায় যে রক্ত শব্দের উৎসের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, নীল রং দেখায় রক্ত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, ঠিক কি না?

অনিমেষ প্রচণ্ড জোরে মাথা নাড়ে। তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবার আশায়।

—এই পদ্ধতিতে—যাকে আজকাল আলট্রাডোপোগ্রাফি বলা হচ্ছে, নির্ভুলভাবে ব্রেনস্ক্যান করা সম্ভব হয়েছে। ...পঁচিশ বছর আগে একথা কে বলে গেছল জান?

বলির পাঁঠার মতো মাথা নাড়ে অনিমেষ—না।

—আমি। ইয়েস—এই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেদিন আমার কথায় কেউ এ গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। আর আজ তারাই কোটি কোটি টাকা দিয়ে আমেরিকা থেকে মেশিন কিনে বসাচ্ছে, ব্রেনস্ক্যানিং-এর জন্য। এর জন্য দায়ী কে জান? হীনমন্যতা। আমরা ভারতীয়রা নিজেদের ছোটো ভাবি।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। আমি এবার উঠি। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে অনিমেষ।

—ঠিক আছে, আমারও একটু কাজ আছে। তুমি কিন্তু আজ রাতে আসছ।

—হ্যাঁ, রাত দশটা নাগাদ আসব।

বাড়িতে এসে টিভি খুলে বসে অনিমেষ। সান টিভিতে তামিল গান চলছে। এ ক-দিন এখানে আসার পর থেকে চারপাশের অর্ধশিক্ষিত লোকজন দেখে অনিমেষের নিজের ওপর বিশ্বাস অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আজ হঠাৎ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে নিজেকে অন্যরকম লাগছে। ভদ্রলোকের অগাধ পাণ্ডিত্য। রাতে কী একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাবেন বলেছেন। সাত-পাঁচ ভেবে অনিমেষ ঠিক করল, শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়ি যাবে। যা থাকে কপালে।

রাত দশটায় ওনার বাড়ির গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় অনিমেষ। গেট বন্ধ। কলিংবেল টিপতেই ভেতরের দরজা খুলে গেল। শ্যামাপ্রসাদবাবু বেরিয়ে এলেন। ঘরের ভেতর থেকে দেবব্রত বিশ্বাসের গান ভেসে এল—'সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ ধারা'।



ঢুকতেই একটা ছোটো প্যাসেজ। ডানদিকে ড্রয়িংরুম। সোফাসেট সাজানো। সামনের টেবিলে বইয়ের স্তূপ। উলটোদিকের আলমারিতে অজস্র ক্যাসেট। বেশিরভাগই রবীন্দ্রসংগীতের। ঘরের মাঝখানে একটা চওড়া কাঠের দোলনা আছে। এটা দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ বাড়িতেই দেখা যায়। ব্রাহ্মণদের বাড়িতে তো থাকবেই।

কৃষ্ণ এসে সরবত দিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে একটা অনটনের ছাপ পড়েছে। সামনের পালিশ-চটা টেবিলটা, ঝাড়লন্ঠনে জ্বলতে থাকা একটা মাত্র আলো—তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ আরও খানতিনেক বই টেবিলের অবশিষ্ট জায়গায় রেখে বললেন—দেখো বইগুলো। খুবই সরলভাবে লেখা। ভীষণ ইন্টারেস্টিং। আমি একটু প্রস্তুত হয়ে আসছি। বলেই পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন।

দরজা বন্ধ করে ভেতরে কী করছেন কে জানে? অনিমেষ বই তিনটে এক এক করে নেড়েচেড়ে রেখে দেয়। তিনটেই দুর্বোধ্য রোবটিক্স-এর ওপর। তার থেকে গান শোনাই ভালো।



মিনিট দশেক পরে শ্যামাপ্রসাদবাবু পাশের ঘর থেকে ডাক দেন—ভেতরে এসো।

ঘরে ঢুকতেই শ্যামাপ্রসাদবাবু দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকারে খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে অনিমেষ।

ঘরে একটা সবুজ আলো এবার ছড়িয়ে পড়ল। একটা রংচটা হাতলওয়ালা চেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে শ্যামাপ্রসাদবাবু বলে ওঠেন—বসো। আগে তোমাকে রোবটিক্স সম্বন্ধে কিছু বেসিক কথা বলে নিই। একটা আধুনিক রোবট তৈরি হয় লোহা, স্টিল আর প্লাস্টিক দিয়ে। এর তৈরির সময় মূলত দুটো জিনিসে লক্ষ রাখতে হয়। রোবটের কোন কোন অংশ ঠিক কীভাবে চালনা করা দরকার। যেমন ধরা যাক, হাত, ঘাড়, কবজি—একেকটার একেকরকম মুভমেন্ট। সেই অনুযায়ী মেকানিকাল ডিজাইন করা দরকার। আর রয়েছে এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। রোবট টিভিক্যামেরা, ভিডিকন ক্যামেরা ইত্যাদির সাহায্যে চারপাশে লক্ষ রাখে। ওই সমস্ততে তোলা ছবির আলোসংবেদী কোষের মাধ্যমে তড়িৎসংকেতে রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন সেন্সরে যায়। আর সেইসব সেন্সর থেকে তড়িৎসংকেত যায় কম্পিউটারে। এই কম্পিউটারই হল রোবটের ব্রেন। এই কম্পিউটারে যেরকম প্রোগ্রাম থাকে সেই অনুযায়ী রোবট কাজ করে।

অনিমেষ অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে—কিন্তু আপনি কী দেখাবেন বলেছিলেন?

—হ্যাঁ। আমি তখন মাদ্রাজ আই. আই. টি.-তে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রোবটিক্স নিয়ে গবেষণায় মেতে আছি। হঠাৎ ডি. আর. ডি. ও. অর্থাৎ ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন থেকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট পেলাম। যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য গুপ্তচর রোবট তৈরি করতে হবে। এর চেহারা হাবভাব হবে হুবহু সাধারণ মানুষের মতো, যাতে বিপক্ষ দেশের সামরিক সংস্থায় ঢুকে খবর আদায় করতে পারে। রোবটের নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধি বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থাকবে, যাতে ও ধরাবাঁধা কাজের বাইরে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে পারে। শুধু তাই নয়, রোবটের হিপ্‌নোটিজম-এর ক্ষমতা থাকাও বাঞ্ছনীয়, যাতে সহজেই ও অন্য কাউকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে পারে।

ব্যাপারটা শুনেই বুঝতে পারছ যেকোনো বিজ্ঞানীর কাছেই এটা একটা অভাবনীয় চ্যালেঞ্জ। আমি আর প্রফেসার ওয়াই. এ. শর্মা ঝাঁপিয়ে পড়লাম কাজটাতে। কিন্তু সাফল্য তো আর একদিনে আসে না। একবছর যেতে-না-যেতেই ওয়াই. এন. শর্মা ধৈর্য হারালেন। এবং ওই প্রোজেক্ট থেকে বেরিয়ে এলেন। আমার দিনরাত জুড়ে রইল 'চাণক্য'। ওই নামটাই ঠিক করে রেখেছিলাম রোবটটার জন্যে। একটা কৃত্রিমভাবে তৈরি চামড়া রোবটের গায়ে পরানো হল। চামড়ার নীচে রইল লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রনিক প্রিন্টেড বোর্ড, যারা স্পর্শ অনুভব করতে পারে। এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক সাফল্য পেলাম। গায়ে একটা ছুঁচ ফোটালে, ও সেই ছুঁচের ব্যাসার্ধ অবধি বলে দিতে পারে।

রোবটের ভেতরে পঞ্চান্নটা মাইক্রোফোন বসালাম, যারা চারপাশের শব্দতরঙ্গকে তড়িৎসংকেতে পরিবর্তিত করে কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে ও বিভিন্ন লোকের কথা বুঝতে পারবে—একবার কথা বললেই চিনে রাখবে।

বছর খানেকের মধ্যেই সাফল্য পেলাম। চাণক্য একদম স্বাভাবিক মানুষের মতো আর পাঁচজনের সঙ্গে কথার আদানপ্রদান করতে শিখল। কম্পিউটারে সফটওয়্যার এমনভাবে লিখলাম, যাতে ও বিচার করে চটপট উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এভাবে গবেষণা যখন চলছে সাফল্য-অসাফল্যের পথ ধরে, হঠাৎ খবর পেলাম আমাদের প্রোজেক্ট বাতিল হয়ে গেছে। বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে ওই ধরনের রোবট কেনা হয়েছে। অবশ্য তার গুণমান আমার চাণক্যের থেকে অনেক খারাপ।

শুধু তাই নয়, আমার অসম্পূর্ণ চাণক্যকেও ফেরত দিতে হবে ডি. আর. ডি. ও.-এর কাছে।

দুঃখে হতাশায় আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। ঠিক করলাম চাণক্যকে চুরি করে অন্য কোথাও পালিয়ে যাব। চলে এলাম কুন্‌জনডিওরে।

তখন এ জায়গাটা আরও ফাঁকা ছিল। চাকরি গেলেও আমার বেশ কিছু সঞ্চয় ছিল। তা দিয়েই বাকি কাজে লেগে পড়লাম।

এরপরে যেটা করলাম, তা হল রোবট যাতে প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয় পরিবেশে এবং আগুনের মধ্যেও কাজ করতে পারে। চাণক্যের হাত-পা নাড়ানাড়ির কাজে ইলেকট্রিক সার্ভোমোটর আছে। এত নিখুঁতভাবে তা চালনা করে যে বোঝাই যায় না চাণক্য স্বাভাবিক মানুষ নয়।

এই রোবটকে কন্ট্রোলের জন্য ইনফ্রা-রেড তরঙ্গ ব্যবহার করলাম, যাতে দূর থেকেও ওকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। অবশ্য নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থাতেও রোবট কাজ করতে পারে নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধির সাহায্যে। আর এই জায়গাতেই বেশ মুশকিলে পড়লাম।

রোবটের আর যাই হোক সাধারণ বিচারবুদ্ধির ব্যাপারটা খুবই কম। চিন্তাশক্তি বাড়ানোর জন্য রবীন্দ্ররচনাবলি কিনে দিলাম, কিন্তু ও দেখি তা ছেড়ে 'সান টিভি'র নাচগান দেখে। লোকের সঙ্গে কীরকম মিশতে শিখেছে পরীক্ষা করতে কৃষ্ণর সঙ্গে বাজারে পাঠালাম। তাতেও সে এক হুলস্থুল কাণ্ড। পচা আলু দিয়েছে বলে দোকানির কান মলে দিয়েছে। তারপর যা হয় আর কি! আমি কৃষ্ণকে রান্নায় তেল কম দিতে বলি—ও সেটা লক্ষ করেছে। পরে একদিন শুনলাম সামনের বাড়ির এক বউকে বেশি তেলে রান্না করতে দেখে, ও তাকে রীতিমতো ধমকধামক দিয়ে এসেছে।

অবশ্য পরের দিকে ওর এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

তবে একটা জিনিস চাণক্যের ব্যাপারে বলতেই হবে। তা হল ওর দেশভক্তি। জনগণমন শুনলেই দাঁড়িয়ে ওঠে। ক্ষুদিরামের গল্প শুনলে চোখ ছলছল করে। অবশ্য হবে নাই বা কেন, ওর মাইক্রোপ্রসেসারে স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর প্রায় দেড়হাজার বইয়ের তথ্য ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

চাণক্যের ওপর আমার গবেষণা যখন প্রায় শতকরা নব্বইভাগ সফল, তখন আমার গবেষণার সাফল্য জানিয়ে ভারতের নানান বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানে চিঠি লিখলাম। যদি কিছু অর্থসাহায্য পাওয়া যায়, তাহলে গবেষণা আরও একটু এগোনো যায়। কারণ আমি দেনার দায়ে ডুবে গেছি। গবেষণা আমার একার পক্ষে চালানো অসম্ভব। চাণক্যের মধ্যে হিপনোটাইজ করার ক্ষমতা, অন্যের মনে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা তৈরির জন্য বেশ কিছু দুর্মূল্য যন্ত্র লাগবে।

কিন্তু আমার কথা কেউ বিশ্বাসই করল না, সাহায্য তো দূরের কথা।

অনিমেষ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে—এখন চাণক্য কোথায়?

—ওই যে বড়ো বাক্সটা দেখছ, ওর মধ্যে। ...ওঃ হো, এখন তো ওর ঘুমোবার সময়। আর তো ওকে ডাকতে পারব না। ঠিক আছে সব তো শুনে গেলে, পরে আর একদিন দেখাব।

অনিমেষকে এরপরে বাড়ির গেট অবধি এগিয়ে দিয়ে শ্যামাপ্রসাদবাবু ফিরে গেলেন।

পরের দিন এ ব্যাপারে অনিমেষ কথা বলছিল সুন্দরেশনের সঙ্গে। কী অভাবনীয় আবিষ্কার! অনিমেষ শ্রদ্ধায় বিগলিত।

সুন্দরেশন খুব গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ শুনে জিজ্ঞেস করল—তা, তুমি সে চাণক্যকে দেখেছ?

অনিমেষ মাথা নাড়ে। হাসিতে ফেটে পড়ে সুন্দরেশন—তুমিই এরকম একমাত্র বোকা নও। তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে কেউই বাদ পড়েনি। সবাই শ্যামাপ্রসাদবাবুর চাণক্যের গল্প শুনেছে। অথচ কেউ চাণক্যকে দেখেনি। চাণক্য খালি ঘুমোয়। বাক্সের মধ্যে। হাঃ... হাঃ...

অনিমেষ লজ্জায় হেসে ফেলে—আসলে এমনভাবে বলছিলেন যে কথাটা মিথ্যা হতে পারে, ভাবতেই পারিনি।

সুন্দরেশন বলে ওঠেন—হ্যাঁ, ভদ্রলোকের জন্য দুঃখ হয়। খুবই প্রতিভাবান ডেডিকেটেড লোক। তবে একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে তো সবসময় সবকিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বছরের পর বছর চেষ্টার পরেও যখন দেখেছেন যে ওনার গবেষণায় কাজ হচ্ছে না, তখন মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ক্রমাগত ব্যর্থতার চাপে উনি একদম ভেঙে পড়েছেন। এখন ওনাকে একধরনের পাগলই বলা যায়। তবে এটাও ঠিক ভারত সরকার ওনাকে কোনো সাহায্যই করেনি।

পরদিন সন্ধ্যায় অনিমেষ শ্যামাপ্রসাদবাবুকে আর দেখেনি। হয়তো ঘরেই কাজ করছেন। অনিমেষের একটু ঢুলুনির মতো এসেছিল, হঠাৎ বাইরে হইচই শুনে ও বেরিয়ে এল। উলটোদিকে এম. এন. কৃষ্ণনের বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। বাজির থেকেই লেগেছে হয়তো। বাইরে একগাদা লোক। জলের বালতি নিয়ে ছোটাছুটি চলছে। দমকলে

খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মেট্রর থেকে আসতে আসতে কমপক্ষে আধঘণ্টা। ভেতরে পুরো কৃষ্ণনের পরিবার আটকে পড়েছে। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে শ্যামাপ্রসাদবাবু বেরিয়ে এলেন—কী অনিমেষ, ভেতরে কেউ আটকে পড়েছে নাকি?

'হ্যাঁ' বলতেই যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। শ্যামাপ্রসাদবাবু ছুটে আগুনের মধ্যে ঢুকে গেলেন। নিশ্বাস বন্ধ করে দেখতে থাকে অনিমেষ। এখানকার সবার কাছে উনি পাগল—অথচ ওদের বিপদে উনি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। এতখানি আত্মত্যাগী? এতখানি মহান?

খানিকক্ষণের মধ্যেই সবার অবাক দৃষ্টির সামনে শ্যামাপ্রসাদবাবু কৃষ্ণন, কৃষ্ণনের মেয়ে আর স্ত্রীকে উদ্ধার করে বেরিয়ে এলেন।

বেশ ভালোরকম পুড়ে গেছে কৃষ্ণনের মেয়ে ও স্ত্রী। তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্সে ওদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শ্যামাপ্রসাদবাবুও মনে হল একটু আহত হয়েছেন। কিন্তু কারোর সঙ্গে বাক্যালাপ না করে উনি সোজা বাড়িতে ঢুকে গেলেন।

পিছন পিছন অনিমেষও ঢুকল।

—আরে অনিমেষ, এসো ভাই এসো।

—আপনি ওভাবে আগুনের ভেতর ঢুকে গেলেন, আপনার সাহস তো না দেখলে বিশ্বাস করাই যায় না।

—হ্যাঁ, কেউ বিপদে পড়লে মাথার ঠিক থাকে না। ঝাঁপিয়ে পড়ি।

—আচ্ছা, কিছু যদি মনে না করেন, আপনি কিন্তু কাল আমাকে চাণক্যকে দেখাননি। আজ দেখাবেন তো? আপনি দেখান না বলেই লোক আপনার কথা বিশ্বাস করে না।

—দেখো অনিমেষ, লোকের বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না। তবে তোমার যাতে আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা না হয়, তাই তোমাকে আজ আমি চাণক্যকে দেখাব।

শ্যামাপ্রসাদবাবু গতকালের ওই ঘরটাতে অনিমেষকে নিয়ে ঢুকলেন। সবুজ আলো জ্বলে উঠল। কালকের বাক্সটার কাছে অনিমেষকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। একটা চাবি দিয়ে বাক্সের তালা খুলে ওপরের ঢাকা খুলে

ফেললেন। ভেতরে আরেকটা কাচের বাক্স। তাতে শুয়ে হুবহু শ্যামাপ্রসাদবাবুর মতোই দেখতে একটা লোক।

—ইনিই হলেন শ্যামাপ্রসাদবাবু। আর আমি হলাম চাণক্য। ওনার হাতে তৈরি রোবট।

ভয়ে বিস্ময়ে অনিমেষ প্রশ্ন করে ওঠে—তার মানে শ্যামাপ্রসাদবাবু বেঁচে নেই?

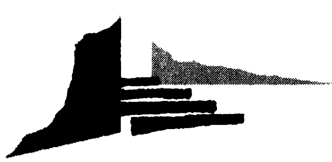
—না। চার বছর আগে আমার হাতে মারা যান। দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অনটন—এসবই শ্যামাপ্রসাদবাবু মানিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু যেটা মেনে নিতে পারেননি, তা হল ওনারই দেশের লোকের ওনার কাজের প্রতি অবহেলা। উপযুক্ত স্বীকৃতির অভাব। দেশের নানান প্রতিষ্ঠানে চাণক্যকে প্রমাণ করতে উনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ ওনাকে বুঝতে চায়নি।

শেষে যখন দেখলেন যে নিজের দেশের থেকে কোনোরকম সম্মান-স্বীকৃতি বা অর্থসাহায্য পাচ্ছেন না, তখন উনি ঠিক করেন যে উচ্চমূল্যে আমাকে অন্যদেশের কাছে বিক্রি করে দেবেন—যারা ওঁর চাণক্যের কদর বুঝবে।

কিন্তু এখানেই উনি ভুল করলেন। ভুলে গেলেন যে ওনার সফ্‌টওয়্যার প্রোগ্রাম আমাকে এমন করে তুলেছে যে আমি আমার দেশ ছাড়া অন্যকিছু ভাবতেই পারি না। তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন উনি আমাকে বিদেশে পাঠাতে বদ্ধপরিকর, তখন আমি এরকম করতে বাধ্য হলাম।

বলতে বলতে চাণক্যের দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

চাণক্য অনিমেষের সামনে এসে ফের বলে ওঠে—তোমাকে আমি সব বলে দিলাম, কেন বলো তো?



ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট

হঠাৎ করে অনিতা বুঝতে পারল যে ও একা নেই। এমার্জেন্সি স্পেসবোটে ওর সঙ্গে আরও কেউ আছে। অনেকসময় আসামি, সমাজবিরোধীরা লুকিয়ে মহাকাশযানে ঢুকে অন্য গ্রহে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করে। অনেকে জীবিকার খোঁজে অন্য গ্রহে পাড়ি দিতে চায়।

কিন্তু ওর এগারো বছরের চালক জীবনে এরকম ঘটনা এই প্রথম। স্পেসক্যাডেট হবার কোর্সে এরকম একটা গল্প ও পড়েছিল সে বহু যুগ আগে লেখা। তখন গল্প ওয়েফার নয়, কাগজে লেখা হত। সেই সময়ের কথা। তখন লোকে চাঁদে পা রাখতে পারলে লাফালাফি করত। তা সে গল্পের ঘটনাই যে ওর জীবনে ঘটে যাবে একথা কখনো ভাবেনি অনিতা।

—আর দেরি না করে বেরিয়ে এসো। তোমার বিনা পয়সায় মহাকাশ ঘোরা শেষ।—লেসার ছুরিটাকে পাশের ঘরের দরজার দিকে তাক করে ও বলে উঠল। আত্মরক্ষার জন্য যেকোনো সময় লেসার ব্যবহার করতে হতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় এরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কেউ আক্রমণ করে, কেউ ভাঙচুর শুরু করে। কেউ কাঁদে, কেউ-বা করুণা ভিক্ষা করে। কিন্তু মহাকাশযানে লুকিয়ে ঢোকা এমন পলাতকদের ভাগ্যে একটা জিনিসই শেষ পর্যন্ত জোটে। তা হল মৃত্যু। বন্দুক থেকে বেরোনো লেসার এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে এদের শরীর পুড়িয়ে দেয়।

—বেরিয়ে এসো, না হলে লেসার ছুড়তে বাধ্য হব।

—না, না, আমি বেরিয়ে আসছি। আমাকে মেরো না—বলে দরজার

আড়াল থেকে যে বেরিয়ে এল সে কোনো আসামি নয়, সমাজবিরোধীও নয়, সামান্য আট-ন বছরের একটা ছেলে।

অনিতা বুঝল সেও ভারি সমস্যায় পড়েছে। এটা মহাকাশ। এখানকার নিথর নিস্তব্ধতায়, সীমাহীন অন্ধকারে কোনো মানবতা নেই। মহাকাশযানে একটা বাচ্চা থাকার অর্থ শুধু ষোলো কেজি পে লোড থাকা। অক্সিজেনের খরচ আরও তাড়াতাড়ি হওয়া। এর বাইরে কিছু না।

ছেলেটার দিকে অনিতা তাকিয়ে দেখল। মাঝারি রং, ফর্সার দিকেই বলা যায়। চুল ছোটো ছোটো করে কাটা। বেশ রোগা। বুকের পাঁজরের হাড়গুলো পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। মুখে বোকা বোকা একটা হাসি।

—তোমার নাম কী?

—তীর্থ। ছেলেটা একগাল হেসে জানাল। অনিতার অবশ্য ছেলেটার মুখের হাসিটাও দেখতে ভালো লাগছিল না। ছেলেটা জানে না, যে ওর জীবনে এখন একটাই সত্য, তা হল মৃত্যু। কয়েক মুহূর্ত থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত ওর আয়ু।

—তা তুমি এতে উঠলে কেন? অনিতা প্রশ্ন করে।

কোনো জবাব না দিয়ে ছেলেটা পালটা প্রশ্ন করল—তুমিও তো উঠেছ। তুমি মার্কাস যাচ্ছ, তাই না?

—তুমি জানলে কী করে?

—আমি এও জানি যে তুমি মার্কাস গ্রহের জন্য ওষুধ নিয়ে যাচ্ছ। ওখানে প্লেগ হয়েছে, তাই।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তোমাকে কে বলল?

—এই ওষুধ যেখান থেকে এসেছে, সেই ওষুধ পাঠানোর কোম্পানিতে আমার বন্ধু সাগ্নিকের বাবা কাজ করে। ওর মুখেই সব শুনেছি। ওর সাহায্যেই এই মহাকাশযান অবধি আসতে পেরেছি।

এমার্জেন্সি স্পেসবোটে ঢোকার আগে অনেক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আসতে হয়। নানা জায়গায় বায়োমেট্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চোখের মণি, আঙুলের ছাপ এসব মিলিয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়। সেগুলো পেরিয়ে ছেলেটা মহাকাশযানে ঢুকল কী করে? এসব ভাবতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অনিতা। ফের সজাগ হয়ে লেসার ছুরিটা

টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বলে উঠল—তা তীর্থ, তুমি মার্কাসে যাচ্ছ কেন?

—যদি আমার মা-বাবা ওখানে থাকে! ওরাও তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই না?

—তোমার মা-বাবা মার্কাসে থাকেন? কে বলল তোমায়?

—ঠিক জানি না। তবে থাকতে তো পারে? আমার বন্ধু রাজ বলছিল, আমার মা-বাবা আমার ওপর রাগ করে মার্কাসে চলে গেছে।

—তোমার উপর কেন রাগ করতে যাবেন ওনারা?

তীর্থ এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায় না।

অনিতা চোখ বন্ধ করে মন-সংযোগের চেষ্টা করে। সামনের কম্পিউটারটা খুবই শক্তিশালী। জটিলতম গণনা কয়েক পিকোসেকেন্ডের মধ্যে করে ফেলে। নিখুঁতভাবে বোটের থ্রাস্টার ইঞ্জিনগুলোকে পরিচালিত করে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে নির্ভুল পথে লক্ষ্যে পৌঁছায়। কিন্তু অনিতার আজকের সমস্যার সমাধান কম্পিউটারের হাতেও নেই। স্পেসবোটে ষোলো কেজি বাষট্টি গ্রাম ভর বেশি আছে। প্রতি সেকেন্ডে এর জন্য গড়ে বারো গ্রাম অতিরিক্ত জ্বালানির প্রয়োজন পড়ছে। মার্কাসে পৌঁছোতে আরও তিন-শো চল্লিশ কেজি জ্বালানির দরকার পড়বে। সে জ্বালানির অভাবে মার্কাসে পৌঁছানোর কয়েক হাজার মাইল আগেই ধূমকেতুর মতো মহাকাশে হারিয়ে যাবে এ স্পেসবোট। কথাটা মনে হতেই অনিতার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

বাচ্চা ছেলেটা এরমধ্যে কথা বলে ওঠে—আমি জানি আমার এভাবে লুকিয়ে স্পেসবোটে ওঠা উচিত হয়নি। তাই যেকোনো শাস্তির জন্য আমি প্রস্তুত আছি।

—তুমি জান তোমার কী হতে চলেছে?

—হ্যাঁ, যদি মার্কাসে আমার বাবা-মাকে খুঁজে না পাই, তাহলে আমাকে আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে। ফেরার জন্য ফের কোনো মহাকাশযানে লুকিয়ে আসতে হবে। হয়তো এজন্য মাসের পর মাস আমাকে মার্কাসে অপেক্ষা করতে হবে।

অনিতা মাথা নেড়ে বলে ওঠে—ঠিক সেরকম হবে বলে আমার মনে হয় না। বাকি কথাটা বলে ফেলার সাহস অনিতা খুঁজে পায় না।

ছেলেটা ফের বলে ওঠে—আর আমার বাবা-মাকে যদি খুঁজে পাই—ওর চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে ওঠে—আমি কিছুতেই ওদেরকে আমাকে ছেড়ে থাকতে দেব না। টমি, সাগ্নিক, ঐশানী ওদের সবার মতো আমিও বাবা-মায়ের সঙ্গো থাকব। আমাকে আর রাতের আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে হবে না। একা একা হোস্টেলে থাকতে হবে না। আমরা একসঙ্গো সার্কাসে যাব, মেলাতে যাব। এভাবে মহাকাশযানে চড়ার জন্য আমার যে টাকা দিতে হত তা ওরাই দিয়ে দেবে। ব্যস, তোমাকেও কেউ তাহলে বকবে না।

কত টাকা দেবে? টাকা দিয়ে তো আর মহাবিশ্বের বিজ্ঞানের নীতি আর সমীকরণগুলো পালটানো যাবে না। অনিতা আরেকবার ছেলেটার দিকে তাকিয়ে নেয়। ওর মুখে এখনও সরল হাসি, প্রত্যয়ে ভরা চাহনি।

কয়েকশো বছর আগে মানুষ যখন অনুন্নত ছিল তখন তো কখনো এরকম সমস্যা ছিল না। সভ্যতা যত এগিয়েছে, সমাজের বন্ধন, ভালোবাসা, আকর্ষণ সবকিছু যেন তত কমে এসেছে। বাবা, মা আর সন্তান এমন অনেক ক্ষেত্রেই মহাবিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন মেরুতে ছড়িয়ে পড়ে। কোটি কোটি মাইল দূরত্বের ফাঁকে পরস্পরের সম্পর্ক কোথায় হারিয়ে যায়। ক্লোন করা শিশুদের ক্ষেত্রে তো এটা আরও বেশি হয়। এরা যেন খেলার পুতুল। পুতুল তৈরির পর মনোমতো না হলেই সরিয়ে ফেলা হয়। বাবা-মা বাচ্চার কোনো দায়িত্বই নেয় না। বদমায়েশ, সমাজবিরোধী, দাগি আসামি, বিদ্রোহী এত কিছু থাকতে স্পেসবোটে আশ্রয় নিল এ সমাজেরই শিকার এক সরল, নিষ্পাপ শিশু।

অনিতা কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে মুখ ফেরায়। মার্কাসের সঙ্গো যোগাযোগের চেষ্টা করে—আর্যভট্ট বোট ৩১৬৭৪ অবিলম্বে বেসস্টেশনের কম্যান্ডারের সঙ্গো যোগাযোগ করতে চাই।

খানিকবাদে কম্পিউটারের হাইপারওয়েভ চ্যানেলে একটা গলা ভেসে আসে—বেস কম্যান্ডার জরুরি মিটিং-এ আছেন। কী দরকার?

—আমি অবিলম্বে বেস কম্যান্ডারের সঙ্গো যোগাযোগ করতে চাই। এটা খুবই জরুরি।

—একটু দাঁড়ান, আমি কম্যান্ডারকে লাইন দিচ্ছি।

মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা ভারী গলা শোনা গেল—কম্যান্ডার রজত বলছি। কী হয়েছে?

—আমি মার্কাস থেকে এগারো ঘণ্টা, উনত্রিশ মিনিট, আঠারো সেকেন্ড দূরে। আমার একটা সমস্যা হয়েছে।

—কী? ওষুধ ঠিকঠাক আছে তো?

—হ্যাঁ, ওষুধের কোনো অসুবিধে হয়নি। আমার স্পেসবোটে একজন লুকিয়ে ঢুকে পড়েছে।

—হ্যাঁ, তোমার স্পেসবোটে তো ষোলো কেজি বেশি ওজন আছে। তা যে-ই ঢুকে থাকুক না কেন তুমি তাকে বাইরে ফেলে দাও। এতে আর সমস্যা কী?

—হ্যাঁ, সেখানেই সমস্যা। কারণ যে ঢুকেছে তার বয়স সাত-আট বছর।

—তাতে কী এসে যায়? নিয়ম ভাঙলে একটাই শাস্তি। তা বয়স যা-ই হোক না কেন।

—ও ঠিক বুঝে করেনি। জানত না এর ফল কী। মার্কাসে ওর বাবা-মা থাকে বলে ওর ধারণা। তাদের দেখতেই ও লুকিয়ে এসে ঢুকেছে।

কম্যান্ডারের গলায় এবার দ্বিধা ফুটে ওঠে—দাঁড়াও এখানে আমরা ব্যাপারটা ভেবে দেখছি, কোনো কিছু করা যায় কি না।

—বাচ্চাটাকে কী বলব আমি?

—ওর কাছে কিছু লুকিয়ো না। যেটা হতে চলেছে সেটা এখনই জানিয়ে দেওয়া ভালো।—লাইনটা কেটে গেল।

অনিতা তীর্থর দিকে একবার তাকিয়ে নিল। ইলেকট্রিক শক দিয়ে অজ্ঞান করে ছেলেটাকে এয়ারলকে ফেলে দিলেই এত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু তারপরে? অনিতা নিজেকে কখনো মাফ করতে পারবে?

—তীর্থ, আমি তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই। প্রত্যেকটা এমার্জেন্সি স্পেসবোটের একটা নির্দিষ্ট পে লোড বা বহনক্ষমতা থাকে। এই স্পেসবোটের ভেতরের প্রত্যেকটা মিলিগ্রামও আগে থেকে মাপা। যখন এই বোটে জ্বালানি ভরা হয়েছে তখন তোমার জন্য কোনো হিসেব করা হয়নি। বুঝলে?

তীর্থ পণ্ডিতের মতো মাথা নেড়ে বলে—আমার জন্য স্পেসবোটের থেকে কিছু জিনিস ফেলে দিতে হবে। তাই না?

—মার্কাসের বিজ্ঞানীরা এর কোনো উপায় বের করার চেষ্টা করছে। কিন্তু যদি ওরা কোনো উপায় খুঁজে না পায়, তাহলে মার্কাস পৌঁছানোর আগেই জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে।

—তা তোমাকে ওরা বেশি জ্বালানি দেয়নি কেন?

—এই জ্বালানির দাম খুব বেশি। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন খুবই সামান্য। আমাকে অতিরিক্ত জ্বালানি দেওয়া মানে অন্য কোথাও জরুরি স্পেসবোট না পাঠানো।

—তাহলে তো স্পেসবোট থেকে কোনোকিছু ফেলতেই হবে, তাই না?

অনিতার কাছে কঠোর সত্যটা বলার একটা সুযোগ এসেছিল, স্পেসবোটে একটা জিনিসই এখন অনাবশ্যক—বলতে গিয়েও বলতে পারল না। এরমধ্যে কম্পিউটারের ভয়েস কমিউনিকেশন চ্যানেলে ফের কম্যান্ডারের গলা শোনা গেল। অনিতা কানে হেডফোন পরে নিল। ছেলেটা যাতে কথাবার্তা শুনতে না পায়।

—অনিতা, আমাদের বিজ্ঞানীরা সবকিছু খতিয়ে দেখেছে। তুমি একটা বিশেষ সংক্ষিপ্ত পথে মার্কাসে যাবে। কিন্তু মার্কাসে ল্যান্ড না করে মার্কাসের থেকে দশ হাজার মাইল দূরের কক্ষপথে ঢুকে যাবে। তারপর আমরাই উদ্ধার করে নিয়ে আসব। এতে কম দূরত্ব যেতে হবে বলে তোমার স্পেসবোট দু-কেজি বেশি ওজন বহন করতে পারবে।

—কী লাভ তাতে? আমার তো ষোলো কেজি বেশি দরকার।

—লাভ একটাই। ছেলেটা তিন ঘণ্টা বেশি বাঁচবে। এমনিতে তোমাকে এক ঘণ্টার মধ্যে ওকে মহাকাশযান থেকে ফেলে দিতে হত। সেখানে চার ঘণ্টা সময় পাবে। অনিতাকে নীরব দেখে ওদিক থেকে কম্যান্ডারের গলা ফের শোনা গেল—অনিতা, মনকে দুর্বল করলে চলবে না। আমাদের আর কিছুই করার নেই। ছেলেটার ভবিষ্যৎ আমরা পালটাতে পারব না।

অনিতা কমিউনিকেশন চ্যানেলের লিংকটা বন্ধ করে দিল। তারপর তীর্থকে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। তীর্থ ছোট্ট মহাকাশযানের



চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে—কন্ট্রোল প্যানেল, এল. সি. ডি., স্ক্রিন, নানান ধরনের মিটার, এয়ারলক, সাপ্লাই লকার, ওষুধের ক্যাবিনেট, অক্সিজেন রাখার ট্যাঙ্ক, ঠিক অনিতার শরীরের আকারে তৈরি চেয়ার—সবকিছুতেই তীর্থর একবার হাত দেওয়া চাই। বসার চেয়ারটা টানা সত্ত্বেও সরছে না দেখে চিন্তিত হয়ে বলে উঠল, আচ্ছা যখন ফেলতে হবে, তখন আমরা কী ফেলব?

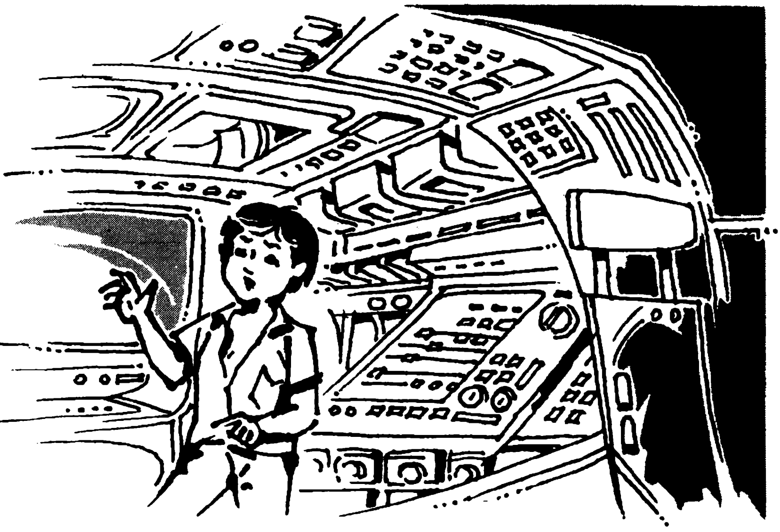
—দেখতেই তো পাচ্ছ, কিছুই ফেলার মতো নেই।

—আচ্ছা, খাবারদাবার ফেলে দিলে হয় না?

অনিতা মৃদু হেসে বলে উঠল—আমরা মহাকাশযানে খাবারদাবার রাখি না।

—তুমি তো ওষুধও ফেলতে পার, তাই না?

—না, ওষুধের জন্যই তো এতদূর থেকে যাওয়া। সাপ্লাই লকার ওয়েল্ড করে মেঝের সঙ্গে শক্তভাবে লাগানো। ওটাও ফেলা যাবে না। যার ওপর আমি বসে আছি, সেটাও তাই। কন্ট্রোল প্যানেল, মিটার আর এসব যন্ত্রাংশের একটাও ফেললে আমরা মার্কাসে পৌঁছোতেই পারব না। সবকটাই অপরিহার্য।



—তাহলে? তাহলে বাইরে আমরা কী ফেলব?

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল অনিতা। তারপরে কথাটা না জনিয়ে আর ও থাকতে পারল না—তীর্থ, নিয়ম অনুযায়ী মহাকাশযানে যে অন্যায়ভাবে লুকিয়ে ঢোকে তাকেই ফেলে দিতে হয়। অন্য কোনো উপায় না থাকায় তোমাকেও হয়তো ফেলে দিতে হবে।

শোনার পর তীর্থ খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খানিকবাদে কথাটা উপলব্ধি করে ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে বলে উঠল—তা বাইরে ফেলে দিলে আমি তো আর মা-বাবার কাছে যেতে পারব না। হয়তো মরেই যাব।

—তীর্থ, এ ছাড়া কিছুই করার নেই।

দরজার দিক থেকে সরে সাপ্লাই লকারের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে তীর্থ বলে উঠল—কিন্তু আমি কী এমন দোষ করেছি যে আমাকে এখান থেকে বের করে দেবে?

—তীর্থ, আমি যদি তোমার জায়গা নিতে পারতাম তো খুশি হতাম। কিন্তু মুশকিল এই যে, এমার্জেন্সি স্পেসবোটটা চালাতে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাইলটের দরকার। তাই তোমাকে এর চালানোর ভার দিলে

ওষুধ নিয়ে তুমি মার্কাসে পৌঁছোতে পারবে না। আমরা দু-জনেই মারা যাব। ওষুধও পৌঁছোবে না।

—অন্য কোনো উপায় কি নেই?

—উপায় নেই, তীর্থ। মার্কাসে নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। দূরে পাঠানোর মতো কোনো স্পেসবোটও ওদের নেই। তাই তো আমরা ওষুধ দিতে এসেছি। আমরা মার্কাসের কোনো কক্ষপথে ঢুকে যাব আর ওরা স্পেসবোটে এসে আমাদের উদ্ধার করবে।—কথাগুলো বলেই অনিতা বুঝতে পারল, এসব কিছু তীর্থর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কন্ট্রোল চেয়ার থেকে উঠে ও তীর্থকে জড়িয়ে ধরল। তীর্থর কান্না থামানোর চেষ্টা করতে থাকল। থামাতে না পেরে ওখানেই তীর্থর পাশে বসে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে তীর্থ বলতে থাকে ওর স্কুলের কথা, বন্ধুদের কথা, ছবি আঁকার কথা আর মায়ের ছবিটার কথা যা ওর সঙ্গে সবসময় থাকে। ওর সবসময়ের কথা বলার সঙ্গী।

মহাশূন্যেও ঘড়ি থেমে থাকে না। তিন ঘণ্টা কেটে গেল। আর এক ঘণ্টা বাকি। তীর্থর সঙ্গে বসে অনিতা কম্পিউটারে চিঠি লিখতে লাগল। বাবা-মাকে তীর্থ লিখছে। ওর ছোট্ট জীবনের অজস্র কথা। কখনো খেলার মাঠের, কখনো বন্ধুদের কথা, কখনো হোস্টেলের কথা, তো কখনো রাগী টিচার মেলিসার কথা। সব থেকে বড়ো সঙ্গী রাতের আকাশটার কথাও লিখতে ভুলল না তীর্থ। সবশেষে তীর্থর মহাকাশযাত্রার কথাটাও যোগ করে দিল অনিতা। চিঠি যখন শেষ হল আর মাত্র কুড়ি মিনিট বাকি। অনিতা মনে মনে হিসেব করতে থাকল। জামা-কাপড়-জুতো সবকিছু ফেলে দিলে তিন কেজির মতো কমবে। ওষুধের প্যাকিংগুলো ফেললে আরও কেজি দুয়েক কমানো যাবে। কিন্তু তাও তো যথেষ্ট নয়।

ভেতরের হাওয়াটা কীরকম ভারী হয়ে আসছে। আসলে এই স্পেসবোটের বাতাস পরিচালন ব্যবস্থা একজনের মতো করেই ঠিক করা। বাতাসের কথাটা খেয়াল হতেই অনিতা আর একটা আশার আলো দেখল। এয়ারলক! এয়ারলকের আয়তন প্রায় তিন ঘনমিটার। এতে খুব উচ্চচাপে বাতাস আবদ্ধ আছে। যদি বাতাসের চাপ এক-তৃতীয়াংশও করা যায় তাহলে অনেকখানি বাতাস বের করে দেওয়া যাবে। তবে

সেটাও কি যথেষ্ট? বড়োজোর আরও দু-কেজি কমানো যাবে। দরকার দশ কেজি কমানোর। সেখানে এসব মিলিয়েও সাত কেজির বেশি কমানো যাবে না।

অনিতা আরও গভীরভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করল। কিন্তু অন্য কোনো উপায় দেখতে পেল না। গন্ডোয়ানা গ্যালাক্সির নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, সজাগ নীরবতা যেন ছেলেটাকে গ্রাস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মানুষ যদি মহাকাশে পাড়ি দিয়ে দূর-দূরান্তের গ্যালাক্সিতে বসতি স্থাপনের চেষ্টা না করে, পৃথিবী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত তাহলে এ সমস্যা কখনোই হত না। কী দরকার ছিল এসবের? অবশ্য তখনও কি মৃত্যু ছিল না? তখনও শিশুরা মারা যেত—অনাহারে, রোগে, দুর্ঘটনায়, অনেক অনেক বেশি হারে। নিজের অপরাধবোধটাকে কমানোর চেষ্টা করল অনিতা।

তীর্থ এগিয়ে এল—আর কত মিনিট বাকি?

—দশ মিনিট।

—আচ্ছা আমাকে এখনই ফেলে দিলে তোমার একটু বাড়তি জ্বালানি থাকবে, তাই না? তাতে পথে কোনো অসুবিধে হলেও জ্বালানি বেশি থাকায় তুমি সামলাতে পারবে। তুমি সাবধানে পৌঁছোলেই ওষুধগুলো ঠিকঠাক পৌঁছোবে। আমার চিঠিও বাবা-মায়ের হাতে পৌঁছোবে।

ছেলেটার বিচারবুদ্ধি বয়সের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। ছোটোবেলা থেকে স্বনির্ভর হওয়ায় এদের বুদ্ধির বিকাশ অনেক তাড়াতাড়ি হয়। অনিতা বলে ওঠে—আমাদের যখন মহাকাশযান চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, তখন নানা ধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে চালাতে শেখানো হয়েছিল। তাই আমার মনে হয় না কোনো অসুবিধে হবে।

—আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে যদি যোগাযোগ হয়, তাহলে আমার লেখা চিঠিটা মনে করে দিয়ে দিয়ো।

—হ্যাঁ, অবশ্যই দেব।

পাঁচ মিনিট বাদে তীর্থকে নিয়ে অনিতা এয়ারলকের দরজার দিকে এগিয়ে এল। এয়ারলকের সামান্য খানিকটা জায়গা মহাশূন্যের ক্ষুধা থেকে স্পেসবোটের ভেতরকে আগলে রেখেছে।

তীর্থর চোখে জল। ওর গালে একটা চুমু খেয়ে অনিতা বলে উঠল—তীর্থ,

তোমাকে বাঁচানোর জন্য আমি কিছুই করতে পারলাম না। কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে বাঁচানোর জন্য যদি আমার হাত দুটোও কেটে দিতে হত তাও বোধ হয় দিতাম—কথাটা বলেই অনিতা থমকে থেমে গেল।.

২

মার্কাসের স্পেসস্টেশন 'বল্মীক'-এর কন্ট্রোলরুম থেকে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন ড. মরো ও ড. চ্যাটার্জি। ড. মরো বলে উঠলেন—ছেলেটা মানসিক শক কাটিয়ে উঠতে আরও ঘণ্টা খানেক সময় নেবে। তারপর ওকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

—হ্যাঁ, শুধু শুধু ঝামেলা, তা অনিতাকে ঠিক করে তুলতে কীরকম খরচ হবে?

—কয়েক বিলিয়ন ডলার। ওর যন্ত্রপাতি এত জটিল যে মেরামত করা খুব মুশকিল। বেশিরভাগ পার্টস পাওয়া যাবে না। আমার মনে হয় ওকে পুনর্গঠনের চেষ্টা না করে ফেলে দেওয়াই ভালো। এর থেকে সামান্য বেশি খরচে নতুন জি-এইটটিন রোবট পাওয়া যাবে। তা ছাড়া অনিতার ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট যেটা আছে, সেটাও ঠিক করা যাবে কি না সন্দেহ।

—কোন ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টের কথা বলছেন?

—বড়ো বেশি নরম প্রকৃতির, বড়ো বেশি মানবিকতা বোধ। ওর মস্তিষ্কের সার্কিটে নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগোল আছে। তা না হলে সামান্য একটা ছেলের জন্য কোনো রোবট তার হাত-পা খুলে ফেলে দেয় শুনেছেন? ছেলেটার বাবা-মা তো সামান্য খরচে আরেকটা ওরকম ক্লোন করে নিতে পারত। একথা চারদিকে রটে গেলে সবাই যত জি-সেভেনটিন রোবট আছে, সব ফেরত দিতে চাইবে। ভাবতে পারছেন কী সাংঘাতিক হবে সেটা?

ড. চ্যাটার্জি সম্মতি জানালেন। তারপরে দু-জনেই লন পেরিয়ে বেস স্টেশন কম্যান্ডারের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ও কি আমি?

বাড়ির কোণের ঠিক ওই ঘরটাই আমার ভয়ের জায়গা। কাছে গেলেই গা ছমছম করে। পা যেন আর চলতে চায় না। মনে পড়ে যায় সেদিনের সেই ঘটনাটা। তবে সে কথা বলার আগে আমাদের এই বাড়ির ব্যাপারে একটু বলে নিই।

আমাদের এই বাড়িটা প্রায় দেড়-শো বছরের পুরোনো। এটা ছিল বিখ্যাত লাটুবাবুদের বাড়ি। বাড়ির পাশেই মস্ত বাগান। সেখানে ছিল কুস্তির আখড়া। পালোয়ানেরা এসে কুস্তির প্যাঁচ কষত। আমার বাবা যখন বাড়িটা কেনেন তখন আখড়াটা বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়ির দরদালানের পাশ দিয়ে ঘিরে থাকা গোল থামগুলো ইটের দাঁত দেখাতে শুরু করেছে। কড়িকাঠের সাপোর্টে উইয়েরা বেশ দাপটে রাজত্ব করছে। খড়খড়ির পাল্লাগুলো এঁকেবেঁকে গিয়ে, খোলা-বন্ধের সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে শুরু করেছে।

বাবা একটু সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। বাড়ির জীর্ণদশা তাতে খানিকটা কাটলেও যৌবন ফেরেনি। বাড়িতে শোবার ঘর, বাথরুম, রান্নাঘর, বসার ঘর—সব মিলিয়ে চব্বিশটা ঘর। লোকের থেকে ঘরই বেশি। তাই যা হয় আর কি! কিছু ঘর পড়ে রইল তাদের বুড়ো-হাবড়া চেহারা নিয়ে।

তা, সেরকমই একটা ঘর ছিল এটা। একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা ডানদিকে ফেলে বারান্দা দিয়ে খানিকটা এগোলেই পাম্পের ঘর।

ঘরটা বেশ অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে। ভেতরে একটা চৌব্বাচ্চা। আর সেই ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হত এই ঘরে। মাঝে ছিল বিবর্ণ, ভারী সেগুন কাঠের দরজা। সে দরজার কড়ায় ভারী তালা ঝুলত। আমাদের দৌড় ছিল ওই অতটা অবধি।

খেলতে খেলতে অনেক সময় আমরা দরজাটা ঠেলে ফাঁক দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করতাম। তাতে ভেতরের অন্ধকার ছাড়া ঘরের অন্য কোনো পরিচয় পাওয়া যেত না। খানিক বাদে বাদে একটা মসমস মসমস আওয়াজ আসত। কাগজের উপর দিয়ে ইঁদুর দৌড়ে গেলে যেরকম হয়—অনেকটা সেইরকম। কেন জানি না মনে হত কে যেন ভেতরে আছে।

কী হতে পারে তা নিয়ে আমরা অনেক গবেষণা করতাম। সুবোধ বলত, এটা নাকি ছিল বিপ্লবীদের ঘর। একবার পুলিশি হামলায় সবাই মারা যায়। কেউ বলত, এ ঘরে অনেক অনেক বছর আগে কেউ একজন মারা গিয়েছিল বলে শোনা যায়। আমরা যে ওই ঘরের ভেতরে দেখার চেষ্টা করি আর দরজার ফাঁকে চোখ রেখে উঁকিঝুঁকি মারি এ খবরটা কেমনভাবে যেন আমার মায়ের কানে গেল। ব্যস, পাম্পের ঘরের দরজাতেও একটা তালা পড়ে গেল। বাড়ির কাজের লোক গণেশের ওপর ছিল পাম্প চালানোর দায়িত্ব। তা ওর কাছেই থাকত ওই ঘরের চাবি। গণেশদার সঙ্গো ভাব করার হাজার চেষ্টাচরিত্র সত্ত্বেও ওই চাবি হাতের নাগালের বাইরে রয়ে গেল। আমরাও ওই ঘরের কথা আস্তে আস্তে ভুলে গেলাম।

এবার ওই দিনের কথায় আসি। সেদিনটা ছিল একদম অন্যরকম। রবিবার। স্কুল ছুটি। সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। শীত পড়তে শুরু করেছে। গায়ে একটা হালকা কিছু পরে থাকতে হচ্ছে। এসময় কোথায় একটু খেলাধুলো করব, তা না সকাল থেকে বৃষ্টি। প্রতীক, সুবোধ, পিন্টুদের সঙ্গো ক্রিকেট খেলার কথা ছিল। তাও মাটি। মনখারাপ করে পড়ার টেবিলে বসে ইতিহাসের বইতে শাহজাহানকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, এমন সময় মামাবাড়ি থেকে খবর এল দাদুর শরীর খুব খারাপ। মা-বাবা খবরটা পেয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন। আমিও হয়তো যেতাম। কিন্তু ওখানে গিয়ে দুষ্টুমি করব ভেবে ওঁরা আমাকে নিয়ে গেলেন না।

বাড়িতে শাসন করার কেউ না থাকলে বেশ ভালো হয়। বিশেষ করে সেটা যদি ছুটির দিন হয়। আমিও তাই শাহজাহানকে ঔরঙ্গজেবের হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্য দরকারি কাজে মন দিলাম। আমাদের ঘরে একটা সিন্দুক ছিল। তাতে যে বিশাল দামি কিছু ছিল তা নয়। সিন্দুকটার মধ্যে মা নানান ধরনের জিনিস রাখতেন। চাবি থাকত আলমারির একটা বন্ধ ড্রয়ারে। কোনটা কোথায় থাকে তা সবই আমার নখদর্পণে। তাই সিন্দুকের চাবিটা পেতে বিশেষ সময় লাগল না। চাবিটা নিয়ে সিন্দুকটা খোলার চেষ্টা করতে লাগলাম। চাবি ঘুরল। কিন্তু ভারী পাল্লা অত সহজে খোলার নয়। বেজায় ভারী পাল্লা। আমিও নাছোড়বান্দা। প্রায় আধঘণ্টা চেষ্টার পরে খুলল পাল্লাটা। সিন্দুকের নীচের দিকে দুটো ভারী ড্রয়ার। স্টিলের ছোটো ছোটো নানা বাক্স তাতে। কিছু প্যাকেট।

আমি বাক্সগুলো ঘাঁটতে শুরু করলাম। কিছু গয়না। আগেকার দিনের কয়েন কিছু। কয়েকটা দামি পেন। বেশ কিছু খাতা, কাগজপত্র। সবুজ রঙের অনেক পুরোনো একটা ডায়েরি। পাতাগুলো লালচে হয়ে গেছে। সাবধানে পাতা ওলটালাম। হাতের লেখা দেখে মনে হয় কমবয়সি কারও লেখা। বাংলায়। কিছু ছোটো ছোটো কবিতা। কিছু রোজনামচা। দু-একটা পাতায় চোখ বোলালাম। পড়ার অত ধৈর্য অবশ্য আমার ছিল না। তবে পাতা ওলটাতে ওলটাতে ডায়েরিটার মধ্যে থেকে একটা জিনিস খুঁজে পেলাম। সেটা হল আমারই বয়সি একটা ছেলের ছবি। কেন জানি না ছবির ছেলেটাকে খুব চেনা মনে হল। বুক অবধি ছবি। চোখ দুটো ভাবালু। দৃষ্টি খুব গভীর। অনেকটা আমার বন্ধু বাবলুর মতো। চোখ-মুখে কেমন যেন দুঃখের ছাপ। ছবিটা বের করে নিলাম। সিন্দুকের ভেতর থেকে আর কিছু না নিয়ে তালা বন্ধ করে আবার চাবিটা আগের জায়গায় রেখে দিলাম। অপারেশন কমপ্লিট।

ছবিটা ডেস্কের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলাম। সাদা-কালো ছবি। এ বাড়িতে তোলা কি? হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির সব জানলাগুলোর মতোই একটা জানালা দেখা যাচ্ছে ছেলেটার পিছনে। কিন্তু এ ঘর তো নয়! কোথায় তোলা হতে পারে ছবিটা?

এতক্ষণ ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিল। এবার জোরে বৃষ্টি শুরু হল। খেলার

আশা যেটুকু ছিল বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটায় সেটাও গেল ধুয়ে। আমাদের বাগান লাগোয়া যে ঘর আছে বর্ষা এলে সেখানে বেশ লাগে। আখরোট, নিম আর কাঁঠাল গাছের পাতায় জল পড়ে বেশ সুন্দর শব্দ হয়। কিছু দূরের ফ্যাক্টরির টিনের শেড বেয়ে জল এসে পড়ে আমাদের বাগানে। জোরে বৃষ্টি শুরু হতেই আমি চলে এলাম ওই ঘরটায়। একটা গল্পের বই নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। 'চাঁদের পাহাড়'।

হঠাৎ চোখ পড়ল সামনের টেবিলে। ওই ছেলেটার সাদা-কালো ছবিটা পড়ে আছে। আশ্চর্য! ওটা তো আমার ডেস্কে রেখে এসেছিলাম। এখানে এল কী করে? ছবিটা হাতে নিতেই শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। যে ছবিটা দেখেছিলাম তার থেকে এটা একটু অন্যরকম। এতে ছেলেটার হাতগুলোও দেখা যাচ্ছে। কেমন যেন সরু সরু হাত। মুখে একটা হাসির ছোঁওয়া। চোখ দুটো বড়ো করে খোলা। হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে আরেকটা জিনিস মনে হল—এটা বোধ হয় নীচের তলার সেই তালা দেওয়া ঘরটা। তখনকার মতো ছবিটা সরিয়ে রেখে আবার 'চাঁদের পাহাড়'-এ ডুব দিলাম।

তখন বিকেল পাঁচটা হবে। বৃষ্টির তখনও বিরাম নেই। খাওয়া সেরে দুপুরে খানিকক্ষণ ঘুমিয়েও নিয়েছি। মা-বাবা এখনও ফেরেননি। চারদিক কেমন যেন ঝিমিয়ে আছে, শুধু ওই বৃষ্টিটা ছাড়া। শীতের বিকেল। বাইরে তাই ইতিমধ্যেই অন্ধকার। লোডশেডিং। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল রান্নার মাসি।

টিমটিমে আলোয় পড়তে বসব বসব করছি, হঠাৎ মনে হল কোত্থেকে একটা আওয়াজ আসছে। ফিসফিসিয়ে কথা বলার মতো। বাইরের বৃষ্টির শব্দের মধ্যেও সে আওয়াজ স্পষ্ট। হ্যারিকেন নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। চারিদিকে আলো ফেলে তাকালাম। নাহ্, কেউ নেই। খাট, পাশের ড্রেসিং টেবিল, ওদিকে সিন্দুক, বুক-কেস—সব যেরকম ছিল, ঠিক সেরকমই আছে। কেউ কোথাও নেই। নীচু হয়ে খাটের তলাটা দেখতে গিয়ে মনে হল আওয়াজটা যেন মেঝের দিক থেকে আসছে। মেঝেতে কান পাতলাম। এবার আরও স্পষ্ট হল আওয়াজটা।

একটা কমবয়সি ছেলের গলা। কথাগুলো শোনা যাচ্ছে না। তবে

এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে সে ভয় পেয়েছে, আর সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকছে। জোরে না—ফিসফিসিয়ে। এ ঘরের ঠিক নীচের ঘরটাই তো সেই তালাবন্ধ ঘরটা! ওখান থেকেই কি আওয়াজটা আসছে? কিন্তু কী করে? ওখানে কে ঢুকতে পারে?

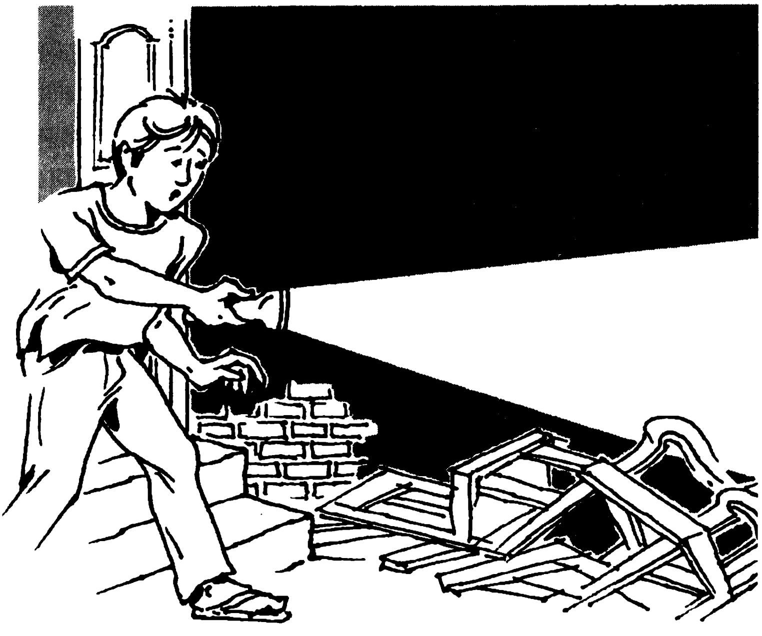
ঠিক করলাম একবার ঘরটা দেখতে যাব। চাবি? তা সে তো গণেশদার কাছে। হঠাৎ খেয়াল হল গণেশদা তো দেশে গেছে। নিশ্চয়ই অন্য কারোর কাছে চাবি রেখে গেছে। রান্নার মাসির কাছে কি? রান্নার মাসির কাছ থেকে চাবি আদায় করা শক্ত হবে না। যেই ভাবা সেই কাজ। টর্চ নিয়ে পা টিপে টিপে নীচে নেমে এলাম। রান্নার মাসির ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। পাম্পের ঘরের চাবি পেতে অসুবিধে হল না। দেওয়ালের একটা হুকে ঝুলছিল। ঘরে কেউ নেই। হয়তো অন্য কাজে ব্যস্ত আছে রান্নার মাসি। টর্চের আলোয় যথাসম্ভব ভালো করে খুঁজেও অন্য ঘরের চাবি কোথাও পেলাম না। তবু ঠিক করলাম পাম্পের ঘরটাই খুলে দেখব। দরজায় কান পাতলেই বোঝা যাবে অন্য লাগোয়া ঘরের মধ্যে কেউ কথা বলছে কি না।

চাবি নিয়ে আস্তে আস্তে পাম্পের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। টর্চের আলোয় তালা খুলতে অসুবিধে হল না। তালাটা হাতে নিয়ে দরজাটা ভেতর থেকে ভেজিয়ে দিলাম। টর্চটা এক মুহূর্তের জন্য নেভাতেই বুঝলাম অন্ধকার কত গাঢ়—যেন আমিই ওই অন্ধকারে মিশে গেলাম। সঙ্গোসঙ্গো আবার টর্চ জ্বাললাম। ঘরের স্যাঁৎসেঁতে দেওয়াল, বাঁ-দিকে জল রাখার চৌবাচ্চা—তাকে ঘিরে খাঁচা মতো করা—রাতের বেলায় সবই কেমন অন্যরকম লাগে। ডানদিকে সেই ঘরের দরজাটা। সেদিকে টর্চ ফেলতেই চমকে উঠলাম। দরজায় কোনো তালা নেই। তাহলে কি কেউ ওই ঘরে ঢুকেছে?

তোমরা যারা আমাকে জান না, তাদের জন্য বলি 'ভয়' জিনিসটা আমার মধ্যে চিরকালই খুব কম। আরশোলাকে ভয় করি না, অন্ধকারে ভয় পাই না, সাপকে ভয় করি না, এমনকী টিচারদেরও ভয় পাই না—কিন্তু দরজায় তালা নেই দেখে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল—তাতে খানিকটা অবাক হওয়ার ভাব, খানিকটা ভয়, খানিকটা আনন্দ। ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। দু-ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে ঘরের মধ্যে নেমে এলাম।

পিছনের দরজাটা খোলা রেখে টর্চের আলোটা সামনে ফেললাম। মাঝের ধুলোর আস্তরণ পেরিয়ে আলোটা গিয়ে আছড়ে পড়ল ঘরের উলটোদিকের বিবর্ণ দেওয়ালে। একপাশে বেশ কয়েকটা ভাঙা চেয়ার পড়ে আছে। সব কিছুর ওপরেই পুরু ধুলোর স্তর। টর্চের আলোয় দুটো ছুঁচো দৌড়ে পালাল। অনেক মাকড়সার জাল ঘরময়।

টর্চের আলোটা চারিদিকে ঘোরাতে গিয়ে হঠাৎ হৃদস্পন্দন থেমে গেল। খানিক দূরে একটা ছোটো চেয়ার-টেবিল। আর চেয়ারে একটা ছোটো ছেলে বসে আছে। সে একদৃষ্টে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার নিষ্পলক দৃষ্টি যেন আমার শরীর ভেদ করে চলে যাচ্ছে। একে আমি ভালো করেই চিনি। অন্তত আজ সকাল থেকে বহুবার এর ছবি দেখেছি। শুধু ছবিতে বুক পর্যন্ত দেখেছি, এখন ছেলেটার প্রায় পুরো শরীরটা আমার চোখের সামনে। রোগা রোগা হাত-পা। হাফপ্যান্ট-হাফশার্ট। সোজা জ্বলজ্বলে চোখে টর্চের দিকে তাকিয়ে আছে।



আমি যেন কীসের আকর্ষণে ওই চেয়ার-টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। ছেলেটা অদ্ভুত খনখনে গলায় বলে উঠল—তুমি কে? তোমার নাম কী?

—আমার নাম পাপুন, তোমার? তুমি এ ঘরে কী করছ?

—সদাশিব। আমি এখানে থাকব না? এটা তো আমার পড়ার ঘর।

—তা, তুমি কে বলো তো? তোমাকে তো এ বাড়িতে কখনো দেখিনি।

—দেখেছ! আমিও তোমাকে ওই একই প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। তুমি কি বেড়াতে এসেছ।

ছেলেটার সাহস দেখে অবাক হলাম। আমাদের বাড়ি। আর বলে কিনা আমি কে? বললাম—আমি তো এখানেই থাকি। জন্ম থেকে। আমার বাবা-মা থাকে। তা তুমি বেশ দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে গেছ, তাই না! আর অন্ধকারে ভূতের মতো বসেই বা আছ কেন?



—অন্ধকার! তোমার চোখটা গেছে নাকি? আমি তো দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। ওই তো টেবিলে আমার মোমবাতি জ্বলছে। এই তো খানিক আগে বুড়িমা মুড়ি দিয়ে গেল খাওয়ার জন্য।

একটু থেমে ছেলেটা আবার বলল—তা তুমি ভাই যে-ই হও, আমার বন্ধু হবে? জান তো, আমার শরীর খারাপ। আর অসুখটা খুব ছোঁয়াচে। তাই তো ওরা আমাকে এ ঘরে রেখেছে। শুধু মা মাঝেমধ্যে আসে। আর কাঁদে।

—তা, তোমার কী হয়েছে?

—এই দেখছ না—আমার হাত-পাগুলো কেমন সরু সরু। অনেক ডাক্তার-বদ্যি দেখেছে। ওরা আসে—আর কীসব একগাদা ওষুধপত্র দিয়ে যায়। বাবা-মায়ের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলে। জানি আমার এ অসুখ আর সারবে না।

—তা, এ ছোঁয়াচে কিছু হবে কেন? একে তো রিকেট বলে।

—তাই বুঝি? বাহ্, তুমি তো অনেক কিছু জান। তা তুমি তাহলে আমার কাছে আসতে ভয় পাবে না—কী বল? ওই সুজন, অমল—ওরা আগে রোজ আসত। এখন আর আসে না। এখন আমি একদম একা থাকি। বোধ হয় বাড়ির লোকেরা বারণ করে তাই ওরা আর আসে না। ওই—ওই যে ছবিটা দেখছ দেওয়ালে—ওতে দেখো ওরাও আছে। ওই দিকের দেওয়ালে।

দেওয়ালের দিকে টর্চ ফেলি। কোনো ছবি তো নেই। তেলচিটে কালো দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। মনে হয় না এ ঘরে গত দশ বছরে কোনো সূর্যের আলো ঢুকেছে বলে। ওই দিকের সব জানালা বন্ধ। বলে কী ছেলেটা?

চারদিকটা টর্চের আলোয় আরেকবার দেখে নিয়ে ছেলেটাকে বলতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু ওই চেয়ারটার দিকে তাকাতেই গায়ে শিহরন খেলে গেল। টর্চের আলোটা গদিহীন চেয়ারের কাঠে গিয়ে পড়ল। কেউ নেই। ওখানে পড়ে আছে একটা কঙ্কাল।

কোনোরকমে লাফিয়ে সরে এসে দরজার দিকে ছুটলাম। এ কী! দরজাটা তো খোলা ছিল—বন্ধ করল কে? জোরে ধাক্কা দিলাম। একটু

ফাঁক হল, কিন্তু খুলল না। নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কেউ তালা লাগিয়ে চলে গেছে। পাগলের মতো ধাক্কা দিতে থাকলাম। কে তালা লাগাল? আরও জোরে ধাক্কা দিতে শুরু করলাম। আওয়াজে কেউ যদি টের পেয়ে এদিকে আসে। হঠাৎ মনে হল, কে যেন পাশে এসে আমাকে জোরে ধাক্কা দিল। খানিকটা দূরে ছিটকে গিয়ে পড়লাম। মাথাটা প্রচণ্ড জোরে ঘরের মেঝেতে গিয়ে লাগল। টর্চটা হাত থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল, কাচ ভাঙার শব্দ পেলাম। একমাত্র যে আলোটুকু ঘরে ছিল, সেটাও আর রইল না।

শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে খানিকবাদে উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে, মাথায় বেশ লেগেছিল, কিন্তু ভয়ে আর কোনো ব্যথা টের পাচ্ছিলাম না। ঘরটা এখনও অন্ধকার, কিন্তু আমার চোখ সয়ে গেছে। দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। একটা লালচে আলো ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে। চেয়ারটার দিকে তাকালাম। ছেলেটা এখনও বসে আছে। মুচকি মুচকি হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। এরকম দৃষ্টি এতক্ষণ দেখিনি। চোখ-মুখে যেন আনন্দের ছাপ।

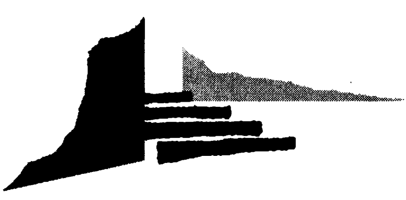
ওর দিকে চোখ রেখে আমি গুটিগুটি পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। দেওয়ালে ভর করে দুটো সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে দরজাটা কোনোরকমে ঠেললাম। সঙ্গোসঙ্গো খুলে গেল দরজা। আশ্চর্য! তালাটা কেউ খুলে রেখে গেছে। বেরিয়ে এলাম কোনোরকমে। চোখ এখন অন্ধকারে ভালোরকম অভ্যস্ত হয়ে গেছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পাম্পের ঘরের চৌবাচ্চা, ডান দিকের কল যেন দিনের থেকেও স্পষ্ট। ছুটে বেরিয়ে এলাম পাম্পের ঘর থেকে। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত।

উফ্ সে কী অভিজ্ঞতা। ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। ভয়ে আমি বাড়ির কাউকে সেদিন কিছু বলিনি। এত বছর বাদেও ওই ছেলেটার মুখ, ওই চাউনি—ভাবলে শিহরন হয়। মনে হয় আমার জন্য আজও ও বসে আছে। সেদিন পালিয়ে এসেছি, কিন্তু আর একবার সামনাসামনি হলে ছাড়বে না।

আমাদের বাড়িটা গত দু-মাস ধরে ভাঙা হচ্ছে। এখানে নাকি একটা বড়ো হাউজিং কমপ্লেক্স হবে। বিশাল জায়গা জুড়ে ছিল বাড়িটা। তাই অনেক জায়গা পেয়েছে। বাগান, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল এসবও থাকবে

নাকি কমপ্লেক্সে। ওই ঘরটা ভাঙা শুরু হয়েছে। আমিও তাই কৌতুহলী হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছি। দিনের আলো যখন ওই ঘরের গভীর অন্ধকারের উপর ছড়িয়ে পড়বে, কী অদ্ভুতই না লাগবে। হঠাৎ করে আঁতকে উঠবে ওই ঘরের স্থায়ী বাসিন্দারা। তারপরে হঠাৎই হইচই শুরু হবে—চেয়ারে পড়ে থাকা কঙ্কালটাকে নিয়ে। নানান জল্পনা-কল্পনা হবে কী করে এল, কবে এল।

ঠিক তাই। একটা হইচই-এর শব্দ শোনা যাচ্ছে ওদিক থেকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। একটা জটলা তৈরি হয়েছে। সবাই আঙুল তুলে কী দেখাচ্ছে। ওই...ওই তো চেয়ারটাতে বসে থাকা বাচ্চা ছেলের কঙ্কাল, এখন যার উপর দিয়ে মাকড়সার জাল তৈরি হয়েছে। কিন্তু লোকেরা তো শুধু ওদিকে তাকিয়ে নেই। অন্য দিকে কী? খানিকদূরে ভাঙা দরজা আর দেওয়ালের থেকে কিছুটা দূরে পড়ে থাকা ওই কঙ্কালটা কার? ছেঁড়া জামা থেকে বেরিয়ে থাকা হাতটা তো কোনো বাচ্চা ছেলের বলেই মনে হয়। ধুলোমাখা একটা ভাঙা টর্চ পড়ে আছে হাত দুয়েক দূরে। কে ও? ও কি আমি?



নতুন মানুষ

ঘরটা পরিষ্কার করতে গিয়ে হবুই ছোটো কাগজটা আবিষ্কার করল। বুজুকে জিজ্ঞেস করল—স্যার, এটা ফেলে দেব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এত জঞ্জাল জমে গিয়েছে। ভালো করে পরিষ্কার করো। বলে একটু থেমে বুজু মুখ ঘুরিয়ে হবুর হাতে ধরা কাগজটার দিকে তাকাল। তারপরই লাফিয়ে উঠে হবুর হাত থেকে কাগজটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলে উঠল, আরে, এটা কোথায় পেলি?

—ওই ড্রয়ারের পিছন দিকের ফাঁকে আটকে ছিল। ড্রয়ারটা সরাতে বেরোল।

এই কাগজটা কতদিন খুঁজেছে বুজু। ছেলেবেলার কত স্মৃতি এই ছোট্ট কাগজটার মধ্যেই আটকে আছে। বুজু কোঁচকানো কাগজটা টেবিলের উপর ফেলে সোজা করার চেষ্টা করল। লালচে হয়ে যাওয়া কাগজটার মধ্যে লেখাগুলো এখনও স্পষ্ট। কী যেন খেলাটার নাম? বিট্‌ল, না বিগ্‌ল, না বগ্‌ল? নীল রঙের বাক্সের উপর সাদা অক্ষরে লেখা ছিল নামটা। তার মধ্যে থাকত বেশ কয়েকটা ইংরেজি অক্ষর লেখা কাঠের কিউব। প্রত্যেকটা কিউবের চারদিকে ছিল চারটে ইংরেজি অক্ষর। ফেলার পর কিউবের উপরের দিকে যে হরফগুলো পড়ত, তা দিয়ে শব্দ তৈরি করতে হত। তিন মিনিটের মধ্যে ওই অক্ষরগুলো দিয়ে যে যত শব্দ তৈরি করতে পারবে, সেই জিতবে।

ছেলেবেলায় বাবা একটু সময় পেলেই ডাকতেন—সোনাই, বগ্‌ল খেলবি?

ডাকটা পেলেই বুজু ছুটে এসে খেলতে বসত। বাবার সঙ্গে খেলার মজাই ছিল আলাদা। খেলার ফাঁকে ফাঁকে বাবা কত মজার মজার কথা বলতেন। খেলায় হারলেও প্রাইজ, জিতলেও প্রাইজ। আর সে প্রাইজটা হল বাবার কাছে একটা গল্প শোনা।

সেদিনও সেরকমই খেলতে বসেছিল। ডাক্তারখানা থেকে ফিরেই বাবার ডাক—সোনাই, খেলবি?

আর বলতে হয়নি। বগ্‌লবাক্সটা বগলদাবা করে ড্রয়িংরুমে হাজির বুজু। বাবাও সঙ্গেসঙ্গে বসে গিয়েছেন খেলতে। তখনও বাইরের পোশাকটাও বদলাননি। প্রথম দু-বার বাবাই জিতলেন। তৃতীয়বার বুজু জিতল। বাবা বুঝি মাঝেমধ্যে জেনেশুনেই হারতেন। তখন চতুর্থবার খেলা চলছে। হঠাৎ দরজায় বেল বাজল। সামান্য সময় পরে আবার বাজল। কেউ যেন খুব দরকারি কাজে এসেছে। বেলের আওয়াজে সে অধৈর্যেরই প্রকাশ। পরপর আরও দু-বার বেল বেজে উঠল। এবার বাবা দরজা খুলতে উঠে গেলেন।

খেলতে খেলতেই বাবার গলা শুনতে পেল বুজু—আপনারা? কথাটার মধ্যে এতটাই অবাক হওয়ার সুর মিশে ছিল যে, বুজুও খেলা ছেড়ে উঠে এল। মাও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাইরে চারজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গে আর একজন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়সি ভদ্রলোক।

—আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু যেতে হবে।

—কোথায়? কেন?

—আপনার বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে। এই দেখুন।

—কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, বাবার গলা কেঁপে উঠল।

—থানায় চলুন। সব বুঝিয়ে বলব।

—ঠিক আছে। আমি একটু পোশাক বদলে আসছি, বলে বাবা সোজা শোওয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর কী ভেবে ড্রয়িংরুমে যেখানে খেলা হচ্ছিল, সেখানে এসে দাঁড়ালেন। খেলার কাগজে খসখস করে কী একটা লিখে বলে উঠলেন—টাইম শেষ হয়ে গিয়েছে। দেখ তো, কে জিতল? একটু থেমে ফের বলে উঠলেন—কাগজটা রেখে দিস।

বুজু কাউন্ট করতে থাকল, কে বেশি শব্দ বানিয়েছে। বাবা না ও, কে জিতবে?

এটাই বোধ হয় ছেলেবেলার দস্তুর। একবারও তো মনে হয়নি, বাবা কোথায় যাচ্ছেন বা কেন পুলিশ এসেছে? অথবা বাবার কী হবে? একটা সামান্য খেলাই এতটা মন জুড়ে থাকে যে, খেয়াল হয় না তার বাইরে কী হচ্ছে।

ও যখন পয়েন্ট গুনতে মত্ত, বাবা ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—আমি এক্ষুনি আসছি সোনাই। এসে শুনব, কে জিতল এবার।

সেবার বাবাই জিতেছিলেন, কিন্তু সে খবর বাবাকে দিতে পারেনি বুজু। বাবাই যে তারপর আর কখনো ফিরে আসেননি।

মাকে অনেকদিন সে জিজ্ঞেস করেছে। মা কেন জানি না, বারবার সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন। কখনো প্রশ্নটা শুনেই রেগে উঠেছেন। তখন বুজু ক্লাস টু-তে পড়ে। তার চারদিকে এমনিতেই অনেক প্রশ্ন। আকাশ কেন নীল? পিঁপড়েরা নিজেদের মধ্যে কীভাবে কথা বলে? রাস্তার কুকুরগুলো কেন নিজেদের মধ্যে সারাক্ষণ ঝগড়া করে? শেষে একদিন বাবার হারিয়ে যাওয়ার প্রশ্নটাও থেমে গেল। বাবার জন্য মন খারাপ করা কান্নাটা চলে গিয়ে শুধু রয়ে গেল কিছু স্মৃতি, আর-একটা অস্পষ্ট চেহারা। দেখতে দেখতে কুড়ি বছর পেরিয়ে এসেছে বুজু। মাও বহুদিন মারা গিয়েছেন। হাতে ধরা কাগজটায় কুড়ি বছর আগের সেই দিনটাকে কুড়িয়ে পেল বুজু। অজানা এক বেদনায় বহুদিন পরেও চোখের জলে দৃষ্টি আবছা হয়ে গেল।

২

কাগজে লেখা শব্দগুলো দেখতে গিয়ে থমকে গেল বুজু। আগে তো এটা খেয়াল করেনি! আগের কোনো শব্দের মধ্যে 'E' নেই। অথচ বাবার লেখা শব্দটা হল, 'CLONE'। যদি কিউবের হরফগুলোর মধ্যে 'E' থাকত, তাহলে তা অন্য যে ৩২টি শব্দ লেখা হয়েছে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই থাকত। গণ্ডগোলটা সেখানেই লাগছে। 'E' দিয়ে তো আরও অনেক শব্দই বানানো

যেত। তাহলে কি 'E' ছিল না? বাবা ওরকম লিখলেন কেন? বাবার মতো পারফেকশনিস্ট কখনোই এমন ভুল করবেন না। বাবা কি 'ক্লোন' দিয়ে কিছু বোঝাতে চাইছিলেন?

হঠাৎ বাবার শেষ কথাটা খেয়াল হল বুজুর, কাগজটা রেখে দিস। বাবা নিশ্চয়ই বলার সুযোগ না পেয়ে ওটার মাধ্যমে কিছু জানাতে চেয়েছিলেন। সেটা ভেবে উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বুজু। কোথায় সেই ফোটোটা? প্রায় পাঁচ বছর আগে বইয়ের আলমারির ভিতর ফোটোটা পেয়েছিল বুজু। পিঠে স্কুলব্যাগ, নীল হাফপ্যান্ট, সাদা জামা, স্কুলের পোশাকে ওরই ফোটো! কিন্তু ওটা কি ওরই ফোটো? কোনোদিন নিজের এরকম ফোটো তোলা হয়েছিল বলে ওর তো মনে পড়ে না। তখন বুজু মনকে বুঝিয়েছিল যে, এরকম হতেই পারে। একমাস আগের ঘটনাই খেয়াল থাকে না। সেখানে অত বছর আগের ঘটনা। তাই নিজের ফোটো হলেও হয়তো বুজু ফোটো তোলার ঘটনাটা পুরোপুরি ভুলে গিয়েছে।

তা নাহয় হল! কিন্তু ফোটোয় কপালের কাটা দাগ কী করে হল? দাগটা যখন চোখে পড়ল, তখন মনে পড়ার মতো নিশ্চয়ই কিছু ওর সঙ্গে ঘটেছিল। কিন্তু সেরকম কিছু তো মনে পড়ছে না। তাহলে কি ওটা ওর ফোটো নয়? ওর মতোই দেখতে অন্য কারও ফোটো? ফোটোটা আর-একবার দেখা দরকার।

হবু, ডেকে উঠল বুজু—আমার অ্যালবামটা নিয়ে আয় তো। ডিজিটাল অ্যালবামে ফোটোটার ডিজিটাল কপি রেখে আসল ফোটোটা ফেলে দিয়েছিল বুজু। কারণটা ঠিক জানে না বুজু, তবে ছেলেবেলায় ওর খুব মনে হত, ওর মতোই যেন আর-একজন কেউ আছে। মা-বাবা যেন ওর মধ্যে তাকেই খুঁজছেন।

ও হয়তো খাচ্ছে। হঠাৎ মা বাবাকে ফিসফিস করে বলে উঠলেন—দেখো একদম একভাবে খায়। মুখে পোঁটলা করে জমিয়ে রাখে। মাথায় হাত না বোলালে কিছুতেই খায় না।

কখনো বা বুজু হয়তো কিছু নিয়ে খুব বায়না করছে, সেরকম হলে মা সাধারণত রেগে যেতেন। কিন্তু মাঝেমধ্যে খুশি হয়ে বাবাকে বলতেন,

ঠিক একরকম অভ্যেস। যেটা চাইবে সেটা না পাওয়া পর্যন্ত ভুলবে না। যতই বোঝাও, ভবি ভোলবার নয়। খানিক পরে আবার বায়নায় ফিরে আসবে। বাবাও সায় দিতেন। চোখের কোণে যেন খুশির ঝিলিক। মা আর ছেলের চেঁচামেচি শুনে মুচকি মুচকি হাসতেন।

তারপর ব্যাডমিন্টন শেখার ঘটনাটাও বুজুর মনে পড়ে গেল। বাবা দামি কোম্পানির ছোটো একটা র‍্যাকেট আর কর্ক নিয়ে এলেন। বুজুর একদম খেলায় আগ্রহ নেই। র‍্যাকেটটাকে দিয়ে কর্কটাকে যতবার মারার চেষ্টা করে, কর্কটা যেন ঠিক ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যায়, আর র‍্যাকেট গিয়ে হাতে লাগে। তবু বাবার দারুণ ধৈর্য ছিল। স্কুলে পাঠানোর আগে রোজ ভোরে মাঠে গিয়ে বুজুকে শেখাতেন। শেষে যেদিন খেলাটা সামান্য আয়ত্তের মধ্যে এল, বাবার চোখে-মুখে সেদিন বুজুর চেয়েও বেশি আনন্দ। বাড়িতে গিয়েই মাকে বলে উঠলেন, দেখো, এও ঠিক চ্যাম্পিয়ন হবে ব্যাডমিন্টনে। অবশ্য বাড়তি 'ও'-টার অর্থ বুজু বোঝেনি। আর এও বোঝেনি যে, সে এমন কী ভালো খেলেছে যে, বাবার এত আশা! অবশ্য প্রশংসাটা যে তার ভালোই লেগেছিল, সেটা তো বলাই বাহুল্য। ওখান থেকেই বুজুর ব্যাডমিন্টন খেলার শুরু।

বুজু কি তাহলে কারও ক্লোন? ওকে কি অন্য কারও মতো করে তৈরি করা হয়েছিল? সে কথাটাই বাবা কি জানাতে চেয়েছিলেন তাঁর শেষ লেখাটায়?

—হবু, বুজু আবার ডেকে উঠল। ফোটোটা ডিজিটালি জুম করে দেখা দরকার!

৩

এদের নাম 'নতুন মানুষ'। প্রশান্ত মহাসাগরের ছোটো ছোটো দ্বীপগুলোয় এরা থাকে। অলিম্পিকের সময় এরা এসে সব খেলায় প্রথম প্রাইজ নিয়ে চলে যায়। সব খেলার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপেই এরা আসে আর বিশ্বসেরা হয়ে ফিরে যায়। এদের কেউ হারাতে পারে না। তবে সব জায়গায় এদের খেলার নিয়ম নেই। কারণ, সাধারণ লোকরা তাহলে সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। বুজু এদের কথা অনেক শুনেছে। কখনোই সামনাসামনি

দেখেনি। এবার এশিয়া লেভেলে ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সে সুযোগ হয়ে গেল। খেলা হবে বোর্নিওতে। বুজু যে হারবে, তা নিয়ে ওর নিজেরও সন্দেহ নেই। কারণ, খেলাটা ছ-বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন লি চ্যাংয়ের সঙ্গো। তবে যতটুকু চেষ্টা করা যায়, ততটা বুজু করবে। এই হারের মধ্যে তো কোনো লজ্জা নেই। নতুন মানুষরাই সবসময় জেতে। বুজুর মতো লোকরা শুধু কতক্ষণ কমপিট করতে পারে তা দেখতেই লোকেরা আসে।

খেলার দু-দিন আগে বুজু খবর পেল, খেলাটা লি চ্যাংয়ের সঙ্গো হচ্ছে না। তার বদলে তাকে খেলতে হবে অনিমেষ দস্তিদারের সঙ্গো। ভারি মুশকিল হল! লি চ্যাং কেমন খেলে, তা অন্তত জানা ছিল। এবার এই নতুন উটকো ছেলে সম্বন্ধে তো কিছুই জানা নেই। সে নাকি লি চ্যাংকে হারিয়ে নতুন মানুষদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। লি চ্যাংকে যে কেউ কোনোদিন হারাতে পারে, এটাই যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল বুজুর। তবে সে যতই ভালো খেলুক, বুজু লড়াই না করে হারবে না। গত দশ বছর ধরে সেও একের পর এক টুর্নামেন্ট জিতে এশিয়ার এক নম্বরে এসে গিয়েছে। মনকে শক্ত করল বুজু। বাবা বলতেন, জেতার জন্য সকলের আগে চাই নিজের উপর বিশ্বাস। মন যেন বলে জিতব, জিতব আর জিতব। ম্যাচের দিন যত কাছে আসতে লাগল, ওর আর অনিমেষের খেলা নিয়ে লোকের উৎসাহ ততই তুঙ্গো উঠতে লাগল। তার একটা কারণ, ওর সম্বন্ধে লি চ্যাংয়ের প্রশংসা। কয়েক মাস আগে বুজুর খেলা দেখে লি চ্যাং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিল যে, যদি কোনো সাধারণ মানুষ তাকে হারাতে পারে, সে শুধু বুজু। একজন নতুন মানুষের কাছ থেকে এরকম প্রশংসা কোনো মানুষ আগে পায়নি। তাই সকলের এত উৎসাহ! যদি কিছু অঘটন ঘটে। গত কয়েক বছরে নতুন মানুষরা আসার পর থেকে সাধারণ কোনো মানুষ ওদের সঙ্গো খেলায় জেতেনি।

৪

কোর্টে ঢুকতেই বুজু বুঝল, দর্শকরা প্রায় সকলেই ওর পক্ষে রয়েছে। ও হাত তুলতেই গোটা স্টেডিয়াম ওর নাম ধরে গর্জে উঠল। বিশাল স্টেডিয়ামের মাঝখানের কোর্টে খেলা হবে। কিন্তু স্টেডিয়ামের যে-কেউ খেলাটা স্পষ্ট দেখতে পাবে। কোর্টের একপ্রান্তে বড়ো একটা জায়গা জুড়ে

বেটিং চলছে, খেলা চলাকালীন যে-কেউ তাতে অংশ নিতে পারবে। স্পনসরদের মধ্যে আছে কোকা টি আর ম্যাক বিস্কুট। দুটোই বুজুর প্রিয়। এগুলো যে বুজুর প্রিয় খাবারের মধ্যে পড়ে, তা জেনেই এরা ইভেন্টে এসেছে।

খেলা শুবুর ঠিক দু-মিনিট আগে অনিমেষ স্টেডিয়ামে ঢুকল। এবার বুজুর চমকে ওঠার পালা! অনিমেষকে দেখতে ঠিক বুজুর মতো, তবে বয়সটা সামান্য কম। লেসারে অনিমেষ ও বুজু, দু-জনেরই প্রোফাইল অর্থাৎ বয়স, ওজন, উচ্চতা, আগের খেলার রেকর্ড, জেতার প্রবাবিলিটি বাতাসে ফুটে উঠল। অনিমেষ বুজুর চেয়ে আট বছরের ছোটো। দুই প্লেয়ারের পাস্ট রেকর্ড, ধারাবাহিকতা, যেখানে খেলা হচ্ছে সেখানকার আবহাওয়ার সমর্থন কতটা পাবে এবং আরও নানা প্যারামিটারের উপর বিচার করে জেতার সম্ভাবনাটা কম্পিউটার নির্ধারণ করে। আজ বুজুর জেতার সম্ভাবনা মোটে ১ শতাংশ।

কম্পিউটার যে খুব একটা ভুল নয়, তা প্রথম খেলাতেই বোঝা গেল। ২১ পয়েন্টের খেলা। প্রথম গেমেই স্কোর হল ৩-২১। মোটে ৩ পয়েন্ট পেয়েছে বুজু। অথচ খেলাটা কিন্তু মোটেই একপেশে হয়নি। প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে অনেকক্ষণ র‍্যালি হয়েছে। কিন্তু বুজু যেখানেই প্লেস করুক না কেন, সেখানে ঠিক পৌঁছে গিয়েছে অনিমেষ। শেষে যখন বুজু সামান্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখনই এসেছে মারণছোবল, সাংঘাতিক একটা স্ম্যাশ। বুজুর পক্ষে আর সেটা তোলা সম্ভব হয়নি। পুরো খেলায় বুজুর প্রতিপক্ষ একটাও ভুল করেনি। একবারও ক্লান্ত হয়ে পড়েনি কিংবা একবারও সামান্যতম অন্যমনস্ক হয়নি। র‍্যাকেটের সামান্য মুভমেন্টে সে দুরন্ত জোরে স্ম্যাশ করেছে। অনেক সময় শেষ পর্যন্ত বুঝতেও দেয়নি যে, কোথায় প্লেস করছে।

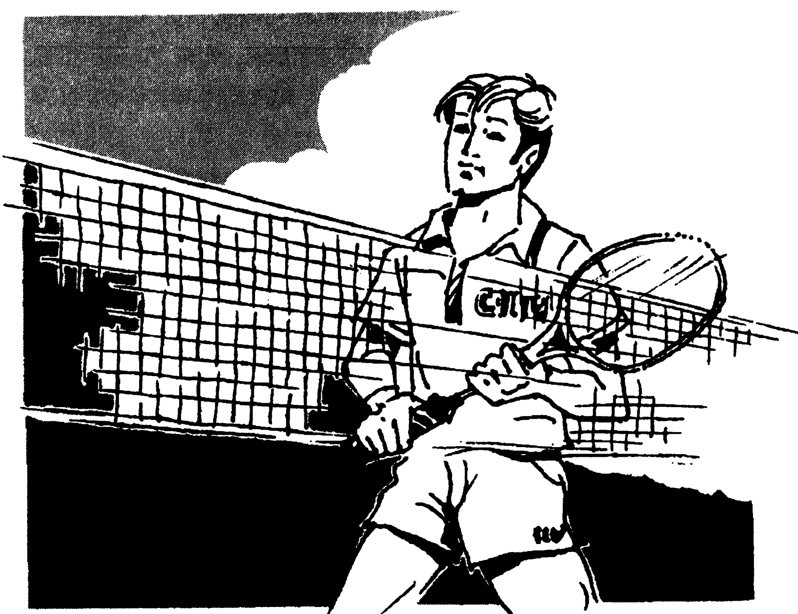
নতুন মানুষরা এরকমই হয়! শুধু যে সেরা সেরা প্লেয়ারদের ক্লোন করে এদের বানানো হয়, তাই নয়! জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাহায্যে এদের যাতে ক্লান্তি কম হয়, কম্পিটিটিভনেস ও একাগ্রতা বেশি হয়, এসব দিকও দেখা হয়। এরা তাই রেসের ঘোড়ার মতো! জন্মানোর পর থেকেই শুধু রেসের জন্য প্রস্তুতি শুবু হয়, আর তা চলে আমৃত্যু!

গত ২০ বছর ধরেই সোমাটিক ক্লোনিং সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। যাতে এর কোনো অপপ্রয়োগ না হয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য লোকেরা নিজেদের ক্লোন তৈরি করে না রাখে। ব্যতিক্রম শুধু এই নতুন মানুষরা। বিনোদনের জন্য এই নতুন মানুষদের তৈরি করা হয়েছে। এরা কেউ বক্সিংয়ে সেরা, কেউ দৌড়ে সেরা, কেউ আবার ফুটবলে। বছরের পর বছর এদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেনিং দেওয়া হয়। তারপর প্রতিযোগিতার মঞ্চে নামানো হয়। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। হাওয়ায় টাকা ওড়ে। লক্ষ লক্ষ লোক এদের অতিমানবীয় ক্ষমতা দেখতে ছুটে আসে।

জল খেতে খেতে বুজু একঝলক দেখে নিল সামান্য দূরে বসা অনিমেষকে। একেবারে ওরই মতো দেখতে। পোশাকের রংটা অন্য না হলে দর্শকরাও গুলিয়ে ফেলত। এতটা মিল কী করে হয়? বুজুর হঠাৎ ওই ফোটোয় দেখা ছেলেটার কথা মনে পড়ল। কিন্তু অনিমেষের বয়স তো বুজুর চেয়ে বেশ খানিকটা কম। ফোটোর ছেলেটার তো ওর চেয়ে বয়সে বড়ো হওয়ার কথা।



এসব ভাবতে ভাবতে সে এতই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে খেয়ালই করেনি, পরের গেম শুরু হওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। আর অনিমেষ কোর্টে দাঁড়িয়ে বুজুর জন্য অপেক্ষা করছে। বুজু খেয়াল করল, দর্শকদের চিৎকার আর ওর সঙ্গে নেই। তারা সমস্বরে চিৎকার করে এখন অনিমেষকে সমর্থন করছে। এর কারণটা হল বেটিং। বুজুর জেতার কোনো সম্ভাবনাই নেই বলে সকলে এখন অনিমেষের উপর বেট ধরছে। তারা এখন মনে-প্রাণে চাইছে, বুজু হারুক। দ্বিতীয় খেলায় বুজু যখন ১-৪-এ পিছিয়ে আছে, একটা স্ম্যাশ তুলতে গিয়ে বাঁ-দিকে খানিকটা ঝাঁপ দিতে হল বুজুকে, আর তখনই বাঁ-পায়ের মাস্‌লে ক্র্যাম্প ধরল। সঙ্গেসঙ্গে কোর্টের মধ্যে ডাক্তার ছুটে এল। ব্যথা কমার স্প্রে দেওয়ায় ব্যথা কমল বটে, কিন্তু আগে যেভাবে সে কোর্টের মধ্যে ছোটাছুটি করছিল, তার অনেকটাই কমে গেল। পরপর পয়েন্ট পেতে লাগল অনিমেষ। ১-১৩ স্কোর দাঁড়াল। এই গেমেও বুজুর হারা নিশ্চিত হয়ে গেল। তিন গেমের খেলায় দুটোই পরপর হারা মানে ম্যাচটাই প্রায় হেরে যাওয়া। সে কি এখন



ইন্‌জুরি দেখিয়ে আর খেলতে অপারগ বলে একটু সম্মানজনকভাবে বিদায় নেবে?

ছেলেবেলায় বাবা একটা গল্প বলতেন। কলেজজীবনে বাবা হর-কি-দুন ট্রেকিংয়ে গিয়ে একবার ভারি মুশকিলে পড়েছিলেন। সেটা ছিল বর্ষার সময়। ট্রেকিংয়ের চতুর্থ দিনে প্রায় ১৫ কিলোমিটার হেঁটে আসার পর হঠাৎ তাঁরা দেখেন, সামনের রাস্তাটা উধাও হয়ে গিয়েছে। সে জায়গায় হাজার ফুট নীচু খাদ উঁকি মারছে। মাঝের ছ-ফুটের মতো রাস্তা নীচে ভেঙে পড়েছে। তারপরে আবার রাস্তা যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। ওঁদের সঙ্গে ছিল জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন কমবয়সি পোর্টার। বাবারা যখন ফেরার কথা ভাবছেন, তখন সেই ছেলেটি বলেছিল যে, ছুটে এসে পাহাড়ের গায়ে পা ফেললে মাঝের জায়গা রাস্তা ছাড়াই পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাতেও সকলে ইতস্তত করছেন দেখে ওই ছেলেটা ছুটে এসে নিজেই সেভাবে পেরিয়ে দেখিয়েছিল। সাহস পেয়ে তখন বাবা ও তাঁর দু-বন্ধু একইভাবে রাস্তাটা পেরিয়ে গিয়েছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব মনে হচ্ছিল, করে ফেলার পর মনে হল সেটা কত সোজা। বাবা তাই বলতেন, পারা বা না পারা, পুরোটাই মানসিক ব্যাপার। তাই জেদ রাখতে হবে আর মনকে বোঝাতে হবে যে, আমি পারবই।

১-১৭! অনিমেষ আলতোভাবে টাচ করল, যাতে নেটের ঠিক পাশ দিয়ে কর্কটা এদিকে এসে পড়ে। বুজু ছুটে এসে চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হল না।

প্রত্যেকটা খেলা কখন শেষ হবে তা স্ক্রিনে দেখানো হয়। খেলার অবস্থার উপর নির্ভর করে কম্পিউটার সেটা দর্শকদের জানায়। সেটা এখন দেখাচ্ছে খেলা শেষ হতে আর দু-মিনিট ২৭ সেকেন্ড অর্থাৎ কম্পিউটারও নিশ্চিত যে, বাকি ক-টা পয়েন্টও অনিমেষই পাবে। ম্যাচও সেখানেই শেষ হবে।

কিন্তু দেখা গেল, কম্পিউটার ভুল হিসেব দিয়েছে। তারপর আরও ৪৫ মিনিট কেটে গিয়েছে, অথচ তৃতীয় গেম চলছে। দ্বিতীয় গেমে পরপর পয়েন্ট পেয়ে ২৪-২২ স্কোরে জিতে নিয়েছে বুজু। তৃতীয় গেমে

হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলেছে। ১৮-১৬তে আপাতত এগিয়ে আছে বুজু। প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে র‍্যালি হচ্ছে, আর প্রত্যেকটা পয়েন্টের পরে দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করছে। সকলের চোখে-মুখে উত্তেজনা। ইতিহাস কি পালটাতে চলেছে? সাধারণ এক মানুষ কি নতুন মানুষদের হারাতে পারবে?

ঠিক এই সময় রুটিনমাফিক একটা ব্রেক হল। বুজু লক্ষ করল, অনিমেষ ওর ফোনে মেসেজ দেখছে। এসময় মেসেজ মানেই কোচের বা অন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ। এখন কারও সম্বন্ধে সবরকম তথ্য খুব সহজেই পাওয়া যায়। কেউ কী খেতে ভালবাসে থেকে শুরু করে তার কী অসুখ হওয়ার আশঙ্কা আছে, এ সবই সামান্য অর্থ খরচ করলে পাওয়া যায়। ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো পলিসি করার সময় বা বিভিন্ন কোম্পানি কাউকে চাকরিতে নিয়োগ করার সময় এসব তথ্য কাজে লাগায়। তাই হতেই পারে, বুজুর সম্বন্ধে এসব তথ্য নাড়াচাড়া করে ওর দুর্বলতা খুঁজে দেখছে অনিমেষ। বুজুর সে সুবিধে নেই। নতুন মানুষদের সম্বন্ধে এসব ইনফরমেশন পাওয়া যায় না। এদের সব তথ্য অনেক গোপনীয়তার সঙ্গো রাখা থাকে।

খেলা ফের শুরু হল। বুজু যা ভেবেছিল, তাই! অনিমেষ খেলার স্ট্র্যাটেজি পালটে ফেলেছে। স্ম্যাশ না করে উঁচু করে থার্ড কোর্টে, বেসলাইনের উপরে, বুজুর বাঁ-দিকে লব করছে। ও কি জেনে গিয়েছে যে, এটাই বুজুর একমাত্র দুর্বলতা; ছেলেবেলায় বাঁ-পাঁজরে চোট পাওয়ার পর থেকে বাঁ-দিকে শরীর বেঁকিয়ে স্ম্যাশ অত ভালো হয় না। কিন্তু এটা তো কারও জানার কথা নয়।

৫

ফ্লাইটেই অচেনা একটা নাম্বার থেকে মেসেজটা পেল বুজু। সাধারণত কোনো অচেনা নাম্বার থেকে মেসেজ এলে সেটা উড়িয়েই দেয় বুজু। এটার ভাগ্যেও তাই জুটত যদি না মেসেজের প্রথম লাইনটা একটু অদ্ভুত হত, 'আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ।' তার পরের লাইনটা দেখে সারা শরীরে শিহরন হল বুজুর।

‘সেদিনের বগ্‌ল খেলাটায় কে জিতেছিল? আমি না তুমি? তোমাদের ফেলে আসতে সেদিন বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু এখনও প্রতি মুহূর্তে তোমার কথাই মনে পড়ে। কিন্তু আমার সে উপায় নেই যে, তোমার কাছে ফিরে যেতে পারব। তাই তোমারই মতো আর-একজনকে তৈরি করেছি। তুমি যার সঙ্গো খেলছিলে, সেই অনিমেষ তোমারই ক্লোন। আমার উপর যাতে অভিমান না হয়, তাই কাগজে প্রকাশিত এই সংবাদটা তোমাকে পাঠালাম। হয়তো তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে।

বাবা’

মেসেজটার সঙ্গো ১২ জানুয়ারি, ২০২০ সালের ‘ডেলি এশিয়া’ পত্রিকার একটা ক্লিপিং। আধপাতার খবরটার সারবত্তা এরকম।

সোমাটিক ক্লোনিং-এর নিষেধাজ্ঞা ভাঙার জন্য দু-বছর আগে বিজ্ঞানী অমিত সান্যালকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। অমিত সান্যাল তাঁর সাত বছরের ছেলে মারা যাওয়ার পর তাঁরই আবিষ্কৃত ক্লোনিং টেকনোলজি প্রয়োগ করেন অর্থাৎ তাকে ফিরে পেতে তারই ক্লোন তৈরি করেন। মানবিক কারণ দেখিয়ে সরকারের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করলেও শেষমেষ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দু-মাস পরে দিল্লিতে বিচারাধীন থাকার সময় হঠাৎ তিনি উধাও হয়ে যান। রহস্যটা এখানেই দানা বাঁধে। সরকার পুরো খবরটা ধামাচাপা দেয়। কিন্তু তাও খবরটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়, এর পিছনে টেররিস্ট কোনো অর্গানাইজেশন থাকতে পারে। আবার বিরোধী পক্ষের দাবি, এর পিছনে সরকারেরই হাত আছে। তারা বলে, ‘নতুন মানুষ’ প্রজেক্টে ডা. সান্যালকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রজেক্টে আসলে আরও উন্নত মানবজাতি তৈরি করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। সাধারণ লোকের বিরোধিতায় এ প্রজেক্ট বাতিল করা হয়। তবে সে খবর সত্যি কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনেকের ধারণা, অমিত সান্যালের মতো প্রথম সারির ক্লোনিং-বিজ্ঞানীকে ওই প্রজেক্টেরই ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

ঝাপসা হয়ে ওঠা দৃষ্টিতে বাকিটা আর পড়তে পারে না বুজু। শুধু এটুকু বোঝে, আজকের ম্যাচে কেন শেষরক্ষা হয়নি, কেন সে হেরে গেল অনিমেষের কাছে।

জাঁ রেনোর ব্রেন ট্রান্সপ্লান্ট

৮ আগস্ট, সকাল ৯টা, কলকাতা

একেই বলে যোগাযোগ। খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে জাঁ রেনোর কথা ভাবছি, এর মধ্যেই বাড়ির কাজের মেয়েটা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটা জাঁ রেনোর। খবরের কাগজ দেখে কেন রেনোর কথা মনে হয়েছিল সেটা একটু এখানে বলা দরকার। বিখ্যাত স্থপতিবিদ জন বাঁত্তোর কার অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু হয়েছে। খবরটা সংবাদপত্রের প্রথম পাতাতেই বেরিয়েছে। অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে প্যারিসের উপকণ্ঠে এক হাইওয়েতে। রেনোও প্যারিসের ছেলে। ওর মুখে প্যারিসের অনেক গল্প শুনতাম। তাই প্রথমে ওর কথাই মনে হয়েছিল।

রেনোর সঙ্গে গত পাঁচ বছরে আমার কোনো যোগাযোগ হয়নি। লাস্ট চিঠি যখন পেয়েছিলাম তখন ও কেমব্রিজে রিসার্চ করছে। তার আগে হার্ভার্ডে থাকাকালীন ওর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তবে তেমন ঘনিষ্ঠ কিছু নয়। আরেক বন্ধুর মারফত আলাপ।

চিঠি পড়ে আরও অবাক হলাম, ও আমাকে প্যারিসে যেতে লিখেছে এক সায়েন্স কনফারেন্সে যোগদানের জন্য। আমেরিকার একটা ম্যাগাজিনে আমার জিনের উপর রিসার্চের কথাটা কয়েকদিন আগেই বেরিয়েছে। সেটা নিয়ে নানান জায়গায় আলোড়নও পড়েছে, অবশ্য পড়ারই কথা। এক জিনের সঙ্গে আরেক জিনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কীভাবে জেনেটিক রোগ সারিয়ে তোলা যায় তার উপর লেখাটা। তা সে লেখাটা রেনোরও চোখে

পড়েছে। ওখানকার বেশ কিছু বিজ্ঞানী আমার গবেষণার কথা জানতে খুব আগ্রহী, হয়তো আমার গবেষণার জন্য যে প্রচুর টাকা দরকার তারও একটা সংস্থান হয়ে যেতে পারে। যাতায়াতের খরচ, ওখানে থাকা খাওয়ার খরচ সব রেনোই দেবে।

প্যারিসে যাওয়া আমার বহুদিনের শখ। এভাবে হঠাৎ করে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে আশাই করিনি, ফোন করলাম, চিঠিতেই নাম্বার ছিল, যাচ্ছি জানিয়ে দিলাম।

১৭ আগস্ট, ভারতীয় সময় দুপুর দুটো,
বোধ হয় তুরস্কের উপর

টিকিট, ভিসা ইত্যাদি নিয়ে আগের সপ্তাহটা খুব ছুটোছুটি হয়েছে, তবে সবকিছুই যে এত তাড়াতাড়ি মিটে যাবে তা আমি আশা করিনি। তবে এয়ার ফ্রান্সের বিমানে মাটি থেকে ৩৫০০০ ফুট উপরে বসে আছি, ইমিগ্রেশন হয়েছে বম্বেতে, সময় কাটছিল না। লোকজন বেজায় গম্ভীর। সামনের সিটের খাপেতে একটা ম্যাগাজিন ছিল, সেটাই উলটেপালটে দেখছি। দুর্বোধ্য ফ্রেঞ্চ সিনেমা দেখার থেকে ম্যাগাজিন পড়াও ভালো। তা সেটা পড়তে গিয়েই রেনোর বাবার খবরটাও পড়লাম। আমার বন্ধু জাঁ রেনোর ছবি ও সাক্ষাৎকারও বেরিয়েছে পাশে, তা না হলে বুঝতে পারতাম না, ফ্রেঞ্চে লেখা, তাই পুরো ব্যাপারটা বোধগম্য হল না, তবে এটুকু বুঝলাম রেনোর বাবা কোনো এক দু-নম্বরি ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন, ধরা পড়ার আগে আত্মহত্যা করেন। ঘটনাটা দেড় মাস আগের। রেনোর কথা ভেবে খারাপ লাগল।

১৯ আগস্ট, সকাল ১০টা, প্যারিস

বেশ ভালোই ঘোরা হচ্ছে, কাল রাত দেড়টার সময় শ্যাঁপে-ডে-এলিসে ঘুরে ফিরলাম, তার আগেই আইফেল টাওয়ার, সিন নদীতে জাহাজে ভ্রমণ, ভার্সাইয়ে লুইদের প্রাসাদ সব মিলিয়ে প্যারিস ভ্রমণ মন্দ হচ্ছে না, প্যারিস হল রাতজাগা শহর। শ্যাঁপে-ডে-এলিসের রাস্তা রাত একটার সময়ও আলোয় ঝলমল করছে, আর অত রাতেও রাস্তায় সুবেশা তরুণ-তরুণীর

অভাব নেই। সায়েন্স কনফারেন্স পরশু, তবে দেশে থাকতে যত বড়ো কনফারেন্সের কথা ভেবেছিলাম সেরকম কিছু নয়।

রেনো নানান কাজে খুব ব্যস্ত থাকে। বিজ্ঞানী হিসাবেও বেশ নাম করেছে। বড়ো ব্যবসায়ীও, কীসের ব্যাবসা তা অবশ্য এখনও জানি না, বিশাল সম্পত্তির মালিক। আমাকে প্যারিস ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য বি. এম. ডব্লু. সহ এক ড্রাইভার দিয়ে দিয়েছে। আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি নেই।

তবে একটা কথা এখানে না লিখে পারছি না। যে রেনোর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল তার সঙ্গে এই রেনোর অনেক তফাত। রেনোর দাবা খেলার দারুণ নেশা ছিল, ইনফ্যাক্ট আমার সঙ্গে দাবার মাধ্যমেই ওর বন্ধুত্বের সূত্রপাত। তা এবার এসে দাবা খেলতে যতবারই বলি দেখি এড়িয়ে যায়, বলে বড়ো স্লো খেলা। আরও অবাক হলাম ওর পাইপ খাওয়া দেখে, কলেজে থাকাকালীন ও নিজে তো ধূমপান করতই না, যারা করত তাদেরকেও এড়িয়ে চলত। বলত এল্যার্জি আছে। ওর কথাবার্তা, চালচলনে দারুণ ছেলেমানুষি ভাব ছিল। অথচ এখন প্রত্যেকটা কথা অনেক ভেবেচিন্তে বলে, এই যে আমার সঙ্গে এতদিন পরে দেখা, কলেজ-টলেজের আগের কথা মাঝে মধ্যে বলছে বটে, তবে সেসব নিয়ে এমন কিছু উচ্ছ্বাস নেই ওর কথায়। তবে বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও তো বদলায়।

রেনোর বাড়িটা বিশাল। প্যারিসের সবথেকে উচ্চবিত্তদের এলাকায় তিন-চার একর জমি নিয়ে একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। চারিদিকের দেওয়ালে দামি দামি পেন্টিং। পল গঁগা, পিকাসো, ভ্যানগগ মানে কেউ বাদ নেই তাতে। রেনোর বাবাও নাকি বিজ্ঞানী ছিলেন। রেনোর মতে ওর বাবাকে সতীর্থ কিছু বিজ্ঞানী টাকার লোভে ফাঁসিয়েছিল। সে গ্লানি থেকে উনি আর মুক্তি পাননি। তাই শেষমেষ আত্মহত্যা করেন।

খানিক আগে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে রেনো বলে উঠল—অনিলিখা, (এখানে বলে রাখি আগে রেনো আমায় খালি অনি বলেই ডাকত) তুমি কি আমার বাবার নাম শুনেছ? উনি ছিলেন আমার মতে এ শতাব্দীর সবথেকে বড়ো বিজ্ঞানী। মস্তিষ্কের জটিল বিজ্ঞান আমার বাবার মতো আর কেউ জানত না। ষাটের দশকের শেষের দিকে উনি এক অদ্ভুত গবেষণা

করেন। উনি প্রমাণ করেন যে, মানুষ মস্তিষ্কের যে অংশ দিয়ে কোনো একটা সাধারণ জিনিসকে চেনে, আরেকজন মানুষের মুখ মনে রাখার ব্যাপারে কিন্তু মস্তিষ্কের সে অংশ ব্যবহার করে না। এই ফেসিয়াল রেকগনিশন সিস্টেম অনেক বেশি অ্যাডভান্সড। মুখের বিভিন্ন অংশ—নাক, চোখ, মুখ, কান প্রত্যেকটা একই সঙ্গে আলাদা আলাদা করে দেখে পরে সব মিলিয়ে পুরো চিত্রটা তৈরি করে মস্তিষ্কের ওই বিশেষ অংশ। যার ফলে কার অ্যাক্সিডেন্টে আহত অনেককে দেখা যায় যে তারা অন্যসব জিনিস চিনতে পারছে, কিন্তু নিজের মুখ আয়নায় দেখে চিনতে পারছে না। উলটোটাও সত্যি হতে পারে। আমার বাবা কিন্তু লোকের ওই ফেসিয়াল রেকগনিশন সিস্টেম, মানে মুখ চেনার ব্যাপারটা ড্রাগ প্রয়োগে নষ্ট করে দিতেও সক্ষম হয়েছিলেন। এ ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় চারিদিকে প্রচণ্ড গণ্ডগোল শুরু হয়। সরকার থেকে আপত্তি তোলায় বাবা ওই গবেষণা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেরকম কিছু লোক আজও আমাদের বাড়িতে কাজ করে। তোমার সঙ্গে যে ড্রাইভার দিয়েছিলাম সেও এরকমই।

—তাই নাকি! তাই আমি দেখেছিলাম প্রত্যেকবারই আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন আমি সম্পূর্ণ অচেনা, তা এরকম লোককে ড্রাইভার রেখেছ কেন?

—কী করব? আমি চাকরি না দিলে লোকটা তো না খেয়ে মরবে। তা এটাই বাবার একমাত্র গবেষণা নয়। এরকম অনেক আছে। আরেকটা বলি। আমরা চোখে দেখা বলতে যা বুঝি, আসলে জিনিসটা কিন্তু ঠিক সেরকম নয়। আমরা স্মৃতি থেকে তোলা একটা ছবির উপর কল্পনার রং মাখাই। ব্রেন এভাবে শর্টকাট করে। এর জন্যই ম্যাজিশিয়ানরা আমাদেরকে খুব সহজেই বোকা বানাতে পারে। যে জিনিসটা যেরকম হওয়া উচিত, যেরকম দেখে আসছি তার থেকে একটু অন্যরকম হলেই—আমরা আর দেখতে পাই না। এই যে কালকেই ধরো। আইফেল টাওয়ারের আগে তোমার যে ড্রাইভার ছিল আর তার পরে যে ছিল দু-জনে কিন্তু আলাদা লোক। চেহারায় যদিও যথেষ্ট মিল ছিল। আমি জানি তুমি লক্ষই করনি। কারণ হঠাৎ মাঝপথে ড্রাইভার বদলে যাওয়া তোমার কাছে স্বাভাবিক নয়।

তবে ব্রেনের অন্য একটা অংশ আমাদের কল্পনা করা এই চিত্রকে বিচার করে, প্রশ্ন করে, তারপর প্রয়োজনমতো বস্তুটাকে দেখে এই কাল্পনিক চিত্রটাকে পরিবর্তন করে আমাদের সামনে পেশ করে। তাই আমরা চোখ দিয়ে দেখি না, দেখি মস্তিষ্ক দিয়ে। এখন মস্তিষ্কের এই বিচারবুদ্ধিও যদি নষ্ট করে দেওয়া হয় তাহলে সে মানুষ যে কী জগতে থাকবে তা বলে বোঝানো মুশকিল। আমার বাবা ব্রেনের বিভিন্ন অংশের কাজকারবার—এসব নিয়ে খেলা করতে খুব ভালোবাসতেন। সরকারের দিক থেকে এসব গবেষণা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও উনি লুকিয়ে চুরিয়ে করে যেতেন।

—তা তোমার বাবা হঠাৎ আত্মহত্যা করতে গেলেন কেন?

—সেসব কথা পরে বলব। তোমার কনফারেন্সের কাজ শেষ হোক, তারপর তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

ব্রেকফাস্টের মিনিট দশেকের মধ্যেই রেনো বেরিয়ে গেল। এখন এই বিশাল বাড়িতে আমি মোটামুটি একা। আরেকটু বেলা হলে ল্যুভর মিউজিয়াম আর ম্যুজি-ডি-অরসে মিউজিয়াম দেখতে যাব। ল্যুভর আগে রাজপ্রাসাদ ছিল। এখন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বের সবথেকে প্রসিদ্ধ মিউজিয়াম। লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চির মোনালিসা ছবিটা এখানেই আছে। ল্যুভর যাওয়ার আগে ইম্প্রেশনিস্ট আর্টিস্টদের উপরে একটু পড়াশোনা করে নেওয়া ভালো। রেনোর বাড়ির বেসমেন্টে বিশাল লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে বই পড়তে গিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। চিত্রকর মোঁজারের মৃত্যু হয়েছে ১৯৮৬-তে। তা ওনার মৃত্যু নিয়ে আমার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। কিন্তু রেনোর ড্রয়িংরুমে মোঁজারের সই করা একটা ছবি দেখেছি। তারিখ ১৯৮৮, অবশ্য সেটা মোঁজারের অরিজিনাল ছবি নাও হতে পারে। কত উটকো আর্টিস্ট তো নামি নামি আর্টিস্টদের অনুকরণ করে ছবি আঁকে। আমি রেনোর বাড়িতে যেসব ছবি দেখেছি তার বেশির ভাগই হয়তো এরকম নকল। তবু একটা কিন্তু কিন্তু ভাব রয়ে গেল।

২২ আগস্ট, রাত একটা, প্যারিস

কলম ধরতে গিয়েও হাত কাঁপছে। এরকম অবস্থার মধ্যে যে আমাকে পড়তে হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কাল কনফারেন্স ভালোই হয়েছে।

যদিও প্রথমে আমাকে কনফারেন্সের জন্য কলকাতা থেকে এখানে ডেকে আনার কোনো প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাইনি। যখন আমি আমার গবেষণার কথা বলছিলাম, শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ হাই তুলছিল, কেউ-বা পাশের লোকের সঙ্গো কথা বলছিল। পরে ব্যাপারটা বুঝলাম। কনফারেন্সের মূল বিষয় ছিল ব্রেন। তাই যারা এসেছে তাদের কারুরই আমার গবেষণার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। আমাকে মাঝখান থেকে অন্য দেশ থেকে উড়িয়ে এনে কেন হাজির করা হয়েছে কে জানে।

তা সে যাকগে, কনফারেন্সের পর মমার্তে-তে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরলাম। মমার্তে ছিল প্যারিসের আর্টিস্টদের জায়গা। আগে গ্রাম গ্রাম ছিল। এখন প্যারিসের হাওয়া তাও গ্রাস করেছে। ভ্যানগগ এডুয়ার্ড মানে, ক্লদ মোনে, এডগার দেগা, পিকাসো সবাই এ অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছবি আঁকতেন। স্যাকরকয়ার নামে একটা বিখ্যাত চার্চও আছে এখানে।

স্যাকরকয়ারে একটা মজার অভিজ্ঞতা হল। চার্চের ভিতর ঢুকে সার্ভিস শুনছি, হঠাৎ পাশের লোকটার প্রতি খেয়াল পড়ল। এনার সঙ্গো গতকালই রেনোর বাড়িতে বেশ খানিকক্ষণ গল্প হয়েছে। নাম গ্যারি সুলজ্। জার্মান। ফ্রান্সে রেনোর সঙ্গো কী এক দরকারে এসেছেন। সার্ভিসের পরে যখন কথা বলতে এগিয়ে গেলাম, তখন উনি এমনভাবে কথা বলতে শুরু করলেন যেন আমায় প্রথম দেখছেন। গতকালের কথা বলার পর উনি বুঝতে পারলেন আমি কে, কিন্তু তবুও আমাকে চিনতে পারলেন না।

খালি বললেন, গতকাল থেকেই ওনার এই অসুবিধা শুরু হয়েছে। কালকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেও নাকি আঁতকে উঠেছিলেন। কারুর মুখ চিনতে পারছেন না। শিগগির ডাক্তার দেখাবেন। আমি ওনাকে কিছু বললাম না, কিন্তু গাড়িতে ওঠার সময় খটকা রয়ে গেল, তবে কি রেনো ওর বাবার অভ্যাস ছাড়েনি? নিজেও এখন এসব বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালায়, তা না হলে যে ভদ্রলোক কাল অব্দি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, রাতারাতি এতটা পালটে গেলেন কী করে? শুনছিলাম একটা ওষুধের পেটেন্ট নিয়ে ওনার সঙ্গো রেনোর খুব একটা সুসম্পর্ক ছিল না।

রাতে খাওয়ার পরে শ্যাম্পেন হাতেই রেনো আসল কথাটা পাড়ল। —অনিলিখা, তুমি তো যথেষ্টই বুদ্ধিমতী, আশা করি, ইতিমধ্যেই আন্দাজ করেছ যে, আমি তোমাকে খালি কনফারেন্সের জন্য এদেশে নিয়ে আসিনি। আমার লাভ কী তাতে? তোমাকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যই অন্য। তোমার সঙ্গে আমি মিলিতভাবে একটা ব্যাবসা করতে চাই। তোমাদের দেশে তো অনেক বেকার, অনেক গরিব লোক আছে। আমার সেরকম কিছু লোক দরকার। এখানে ওরকম লোক পাওয়া খুব শক্ত। আর সেরকম লোক সিলেক্ট করে আমার কাছে পাঠানোর দায়িত্ব তোমার। মনে রেখো, সে লোক যত হাবাগোবা—যত বোকা হয় তত ভালো। যাতায়াত থাকা-খাওয়া সব খরচ আমার। আমি আমার গবেষণায় ওদের ব্যবহার করতে চাই।

আমি রেনোর স্পর্ধা দেখে অবাক হলাম।—তা তুমি আমার কাছ থেকে সাহায্য পাবে আশা করলে কী করে? আর একথা আগে জানাতে পারতে। না শোনার জন্য এত খরচ করতে হত না।

আমার কথায় মুচকি হাসল রেনো। তারপর খানিকক্ষণ ধরে পাইপে তামাক পুরল। বলে উঠল—এই এটাই একমাত্র শক্ত কাজ বলে আমার মনে হয়, অন্য কোনো কাজই আমার এত শক্ত লাগে না। একটু এদিক-ওদিক হল তো ঠিকমতো আগুন ধরবে না। এই যেমন ধরো বিষপ্রয়োগ। কালকে রাতে কী খেলে মনে আছে? স্টার্জান মাছের ডিম আর টুনা মাছের চপ। যদি এ দুটো খাওয়ার অভ্যেস থাকত তাহলে তফাতটা বুঝতে পারতে। ওর মধ্যে কশিয়ান গাছের বীজ মেশানো ছিল। এমনি খেতে মন্দ নয়, তবে হ্যাঁ—আস্তে আস্তে ব্রেনের রাইট হেমিস্ফিয়ারের যে অংশ বিচারবুদ্ধি, যুক্তিপ্রয়োগ ইত্যাদি ফালতু বাজে কাজে ব্যস্ত থাকে সেটাকে ড্যামেজ করে দেয়। তবে সেটাও খারাপ নয়। বাড়ির বেসমেন্টের একটা ঘরে আমার মাও ওই অবস্থায় আছে। বাবা ওর উপরেই প্রথম পরীক্ষা করেছিল কিনা। পুতুল, খেলনা এসব নিয়ে বেশ আছে, সবসময় আপনমনে হাসছে, তবে সবার তো আর এত আনন্দ সয় না, তোমার যদি এরকম পছন্দ না হয়, এর থেকে মুক্তি পেতে চাও, তাহলে আমার কাছেই আসতে হবে। এর প্রতিষেধক একমাত্র আমারই জানা আছে।



আমি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম—তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছ। আমার ক্ষতি হয় হোক। আমি তোমার আসল চরিত্রটা সবার কাছে তুলে ধরব। পুলিস আমার রক্ত পরীক্ষা করলেই ওই বিষের সন্ধান পাবে, আর তুমি যতই সাবধানী হও না কেন ওই বীজের ডি.এন.এ. প্রিন্ট ঘরে কোথাও রয়ে গেছে।

রেনো হাসতে হাসতে উত্তর দিল—নাহ, এ তো ভারি সমস্যায় ফেললে দেখছি। বসো, বসো, উত্তেজিত হোয়ো না। এত কাঁচা কাজ রেনো করে না। কশিয়ান গাছের বীজ ব্রেন ড্যামেজ করে সেটা আমি আর আমার বাবা ছাড়া বিশ্বে কেউ জানে না। আর মজার কথা এর জন্য তোমার শরীরে কোনো অ্যান্টিজেনও পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে ক্ষতি করে অ্যান্টিবডি, যা প্রতিরক্ষার জন্য ওটা প্রয়োগ করলে আপনা থেকেই তৈরি হয়। তাই এসব আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ করা এদেশের পুলিশের কর্ম নয়। আর তা ছাড়া তোমাকে এখন খালি আমিই বাঁচাতে পারি। তা এখন



তুমি ঠিক করো কী করবে, শিশুদের মত অসীম আনন্দে থাকবে না মাঝে মাঝে পার্থিব দুঃখ কষ্ট এসবের স্পর্শ অনুভব করবে।

বুঝলাম রেনো বেশ তৈরি হয়েই নেমেছে। ওর সঙ্গে এত চট করে রেগে গেলে চলবে না। ঠান্ডা মাথায় বলে উঠলাম—আমি রাজি। তবে একটা জিনিস জানতে চাই—কী পরীক্ষা করবে ওদের উপর?

—তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। তবে একথা যেন কারো কাছে ফাঁস কোরো না। অবশ্য সেরকম বোকামি এখন আর তুমি করবে না জানি। আমার বাবার শেষ গবেষণাটা ছিল সব থেকে চাঞ্চল্যকর। ব্রেন ট্রান্সপ্লান্টের উপর। অবশ্য অত সিম্পল নয়। ধরো এক্স হল একজন সুস্থ সাধারণ ব্যক্তি। আর ওয়াই হল একজন দারুণ প্রতিভাবান ব্যক্তি। ওয়াই-এর ব্রেনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ যদি এক্স-কে দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কী হবে? আমার বাবা পরীক্ষা করে জানতে পারেন যে শতকরা একশো ভাগ ক্ষেত্রেই ওয়াই-এর ব্রেন এক্সকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ওয়াই-এর সমস্ত ক্ষমতা প্রতিভার

অধিকারী হবে এক্স। যুগান্তকারী আবিষ্কার। ধরো পিকাসো মারা গেলেন, কিন্তু মৃত্যুর সময় তার সমস্ত প্রতিভা, ক্ষমতার উত্তরাধিকার দিয়ে গেলেন আরেকজনকে।

—তা এরকম আবিষ্কার তো সরকারকে জানালেই পারতে, প্রচুর স্বীকৃতিও পাবে।

—এই তো মজা। কেউ চায় স্বীকৃতি, কেউ চায় অর্থ, এই যে আমি জামার মতো পালটে পালটে বি. এম. ডব্লু., মার্সেডিজ আর পোর্স ব্যবহার করি, তা কি আর তাহলে পারতাম? আর তা ছাড়া আইনকানুনও যেরকম। জেল হতে পারে। তার থেকে এই বেশ। ওই লোকটি যাকে আধার হিসাবে ব্যবহার করা হয় সেও করে খায় আর আমিও তার উপার্জনের সিংহভাগ হস্তগত করি।

—ও তাই বুঝি আজকাল প্যারিসের চারদিকে নামিদামি লোকেদের এত কার অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে?

চমকে উঠল রেনো। তারপর সামলে নিয়ে বলে উঠল—এজন্যই তোমাকে দলে চাই অনিলিখা। তোমার আইকিউ সাধারণ লোকের থেকে অনেক বেশি। খারাপ লোকের তো আর অভাব নেই। আমি ভালো হয়ে থাকতে চাইলেই তারা ভালো থাকতে দেয় কই। পুলিশও আছে মন্ত্রীরাও আছে। এমন একটা দল গড়ে উঠল—কী করি বলো। তাদের তো আর অখুশি করতে পারি না।

রেনোর সঙ্গো আরও খানিকক্ষণ কথা বলার পর এখন আমি লিখতে বসেছি। দূরে বিখ্যাত নতারদাম চার্চের মাথার কাছে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। এই চাঁদকেও আর চিনতে পারব তো!

২৩ আগস্ট, দুপুর বারোটা, প্যারিস

কালকে সারারাত ঘুমোতে পারিনি। নিজেকে বাঁচানোর জন্য এরকম একটা জঘন্য কাজে জড়িয়ে পড়ব। মাঝে মাঝে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি এমন কী আর খারাপ কাজ। এমনিতেই আমাদের দেশের যা অবস্থা গরিবরা, বেকাররা কী এমন সুখে শান্তিতে আছে। বরং একদিক দিয়ে তাদের ভালোই করা হবে। আবার পরক্ষণেই মনে হল এভাবে তো সব বাজে

কাজের সপক্ষেই একটা যুক্তি খাড়া করা যায়। বেশ খানিকক্ষণ এরকম মানসিক দ্বন্দ্ব চলল। শেষে ঠিক করলাম—যা হয় হোক, পুরো ঘটনাটাই পুলিশের কাছে খুলে বলব।

ঘুম থেকে উঠেই পুলিশের নাম্বার ডায়াল করছি, হঠাৎ রেনো এসে ঘরে ঢুকল, চমকে ফোন নামিয়ে রাখলাম। ওকে আজকে একদম অন্যরকম লাগছিল। কীরকম বিভ্রান্ত দৃষ্টি। মুখে কেমন যেন ভালোমানুষি ভাব। বলে উঠল—কী থামলে কেন? ফোন করো। তুমি না করলে আমিই করব। এই গত দেড় মাসে এরকম কত অপরাধ করেছি কে জানে! তোমার কাছেও কীভাবে ক্ষমা চাইব জানি না। আজকে যেন হঠাৎ করে মনে হচ্ছে নিজেকে আবার ফিরে পেয়েছি।

—তা ব্রেন ট্রান্সপ্লান্টের অপারেশনটা কে করেছিল? বাবার সহকারীরা?

ঠান্ডা গলায় রেনো বলে উঠল—ঠিকই ধরেছ অনি। বাবা বুঝতে পারছিল পুলিশের হাত এড়িয়ে বেশিদিন রেহাই পাওয়া যাবে না। এখন উপায়? আমার বাবা লোক যেমনই হোক না কেন, ছিলেন একদম পারফেক্ট সায়েন্টিস্ট। টাকার লোভ, সম্মানের লোভ সব ছাড়িয়ে গবেষণার লোভ। তা ওনার আত্মহত্যার ঘটনার দু-ঘণ্টার মধ্যেই ওনার নির্দেশমতো ব্রেন ট্রান্সপ্ল্যান্টটা হয়। ওনার ব্রেনের কিছু অংশ এসে ঢোকে আমার ব্রেনে। আমাকে জোর করেই রাজি করানো হয়েছিল। হওয়ার পর থেকে কাল অব্দি বাবার ব্রেনই আমাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। গতরাতে কী হল জানি না, হঠাৎ করে আমি যেন আবার আমার উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলাম। হয়তো বাবা ভাবতেই পারেননি যে আমি ওঁর থেকে বেশি প্রতিভাবান হতে পারি। তাই এক্ষেত্রে আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি। নাও ফোনটা করো, কখন আবার মতিভ্রম হবে, আবার আমাকে বাবার ব্রেন নিয়ন্ত্রণ করবে। পুলিশ আসতে আসতে মিনিট দশেক লেগে যাবে। ততক্ষণ একটু দাবা খেলা যাক। দেখি দশ মিনিটে তোমাকে মাত করা যায় কি না।

নাহ, আর সন্দেহের অবকাশ নেই, এ আমার সেই চেনা রেনোই।

অরিজিতের একটি দিন

নাহ্, অরিজিৎ বড়োই বিপদে পড়েছে। এমন বিপদে আগে কখনো পড়েছে বলে মনে পড়ে না। দু-দুটো কার্ড, দুটোই উধাও। সাধারণত একটা মানিব্যাগে রাখে, আরেকটা জামার বুকপকেটে। ভুলবশত আজকে দুটোই ছিল মানিব্যাগে। আর সেই মানিব্যাগটাই গেছে চুরি হয়ে। চুরি হয়েছে বলা ঠিক হবে না, কারণ চুরি খুব কমই হয়। হয়তো কোথাও পড়েই গেছে। মানিব্যাগে আরও অনেক দরকারি জিনিস ছিল। কিন্তু তা নিয়ে অরিজিতের কোনো মাথাব্যথা নেই। শুধু চিন্তা কার্ডটা নিয়ে। জেনেটিক কোড (Genetic Code) কার্ড। এখন ওর পক্ষে ও-ই যে ও, মানে ও-ই যে ঘোষপাড়া ৩৩ নম্বর বাড়ির দোতলার বাসিন্দা—মাল্টিমিডিয়া কোম্পানি 'অনিকেত'-এর পদস্থ অফিসার অরিজিৎ—তা কাউকে বোঝানো ভারি মুশকিল।

ম্যাগলেভ ট্রেন থেকে নেমে মাঠে বসে মাথাটা একটু ঠান্ডা করে নিল অরিজিৎ। মাথা খাটিয়ে একটা উপায় বার করতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। আরেকটা ডুপ্লিকেট কার্ড আছে বটে, কিন্তু সেটা বাড়িতে। পাওয়া মুশকিল। কারণ কার্ড ছাড়া ফ্ল্যাটের দরজা খোলার চেষ্টা করলে নানান ধরনের অ্যালার্ম বেজে উঠবে। ঘনশ্যামও ব্যাপারটা কীভাবে নেবে কে জানে! এসব অ্যালার্মে সরাসরি লোকাল পুলিশ স্টেশনে খবর চলে যায়। আর থানা থেকে লোক এলে সে আরেক হ্যাপা। হাজাররকম প্রশ্ন। রক্ত পরীক্ষা। সব মিলিয়ে অন্তত এক দিনের ধাক্কা। অথচ অরিজিতের

আজকেই যেতে হবে নিউইয়র্কে। আজকে ওদের বিবাহবার্ষিকী। বিয়ের পর দেখতে দেখতে সাত বছর হয়ে গেল। রিতাকে কর্মসূত্রে নিউইয়র্কে থাকতে হয়। তবে প্রতি দু-সপ্তাহে একবার করে আসে, ঘণ্টাখানেকের জন্য। ওই সময় যা একটু মুখোমুখি কথাবার্তা হয়। বাকি সময় ভিডিয়ো ফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে রোজ অন্তত একঘণ্টা ফোনে কথাবার্তা হয়। গতকালের কথা ভেবে আপনমনে একটু হেসেও নিল অরিজিৎ। ঘনশ্যামকে টিভির সামনে বসিয়ে দিয়ে মনের সুখে ফুলকপি ভাজছিল অরিজিৎ। ঘনশ্যাম পাশে থাকলেই, আর তেল নয় তেল অস্বাস্থ্যকর—এসব বলে ঘ্যানঘ্যান করবে। তারপরে ফোনে কথা বলতে গিয়ে ভুলেই গিয়েছিল। নেহাতই রিতা ওদিক থেকে দেখতে পেয়েছিল। ও সাবধান না করলে তেলটা জ্বলেই উঠত বোধ হয়।

পরের বছর রিতা ব্রাসেলসে ট্রান্সফার হয়ে আসবে। সবাই ইউরোপে ট্রান্সফার চায়। তাই চট করে পাওয়া মুশকিল। ভারতে আসার কথা তো ভাবাই যায় না। ভারতে চাকরি করতে আসা ইউরোপ-আমেরিকার সবার কাছেই স্বপ্ন। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক পরীক্ষায় বসছে ভারতে উচ্চশিক্ষায় আসার জন্য। কিন্তু ক-জনই বা চান্স পায়। ভারতে লিভিং কস্ট একটু বেশি। কিন্তু সুযোগ-সুবিধে, মাইনে সব দিক দিয়ে ভারত এতই এগিয়ে যে সবাই তাতেই রাজি। চাকরিতে অন্তত দশ বছরের অভিজ্ঞতা না থাকলে ভারতে পোস্টিং পাওয়া বেশ শক্ত। তাই রিতা অতটা আশা করে না। আপাতত ইউরোপ হলেই খুশি। অন্তত কলকাতা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা যাবে। হ্যাঁ, ধকল একটু বেশি হবে। কিন্তু সে তো লক্ষ লক্ষ লোক করছে। রিতাই বা পারবে না কেন। তবে পিক্ আওয়ারে প্লেনে জায়গা পাওয়া শক্ত। হয়তো হাতে একটু সময় নিয়ে বেরোতে হবে। যাতে দু-তিনটে ফ্লাইটে জায়গার অভাব হলেও ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছানো যায়। একটা মান্থলি পাস কেটে নিলেই হবে। এসব ভেবে অরিজিতের মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে উঠল। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। আপাতত এ সমস্যার কী করা যায়? আজকের দিনে অন্তত দেখা না হলে—নাহ অরিজিতের আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না। রিতা হাফ ডে ছুটি নিয়ে অফিস থেকে সাত তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসে বসে থাকবে। তারপর সারা সন্ধ্যেটাই নষ্ট।

একটা কাজ করা যায়। ওকে যদি কলকাতায় আসতে বলা যায়। এখনই ফোন করলে ওর পক্ষে টিকিট পাওয়া শক্ত হবে না। তারপরে সাতটা নাগাদ কোনো একটা জায়গায় দেখা করলেই হল। আচ্ছা, ময়দানে আসতে বললেই তো বেশ হয়। খেয়াল হতেই আনন্দে উঠে দাঁড়াল অরিজিৎ। কী সুন্দর ছাঁটা ঘাস, দু-একটা ঘাসফুল ফুটে আছে। খানিক দূরে সাজানো বাগান। দূরে দুটো পায়রা বসে কী যেন খুঁটে খাচ্ছে। বাঁ-দিকে একটা লোক মার্সিডিজ গাড়ির ডিকিটা খুলে বসে ঝালমুড়ি বিক্রি করছে। খানিক দূরে দিঘির জল টলমল করছে। সব মিলিয়ে পরিবেশটা বেশ সুন্দর। অরিজিৎ অবশ্য এর থেকেও অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত। কখনো স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডসে, কখনো নায়াগ্রা ফলসের সামনে আর কখনো বা গঙ্গোত্রীতে। রোজই বেশ খানিকক্ষণ এসব জায়গায় কাটায় অরিজিৎ। ভারচুয়াল রিয়ালিটি (Virtual Reality)-র সাহায্যে ঘরের মধ্যেই এসব দৃশ্য উপভোগ করা যায়। এতটাই সত্যি লাগে যে সেদিন দেখতে দেখতে চেয়ার থেকে উলটে পড়তে পড়তে ও ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। না, কার্পেটের ওপর পড়ে লাগার ভয়ে নয়, সিন নদীতে পড়ে যাবার ভয়ে। প্যারিসে নতরদাম চার্চের সামনে সিন নদীর ধারে তখন বসেছিল তো! খেয়াল হতে বেশ খানিকক্ষণ হেসেছিল অরিজিৎ। আজকের দৃশ্য সেরকম না হলেও অনেক বেশি ভালো লাগল অরিজিতের। ঘাস-মাটির একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। ভিজে ঘাসের ওপর বসে বটগাছের পাতার আড়ালে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো দেখার মধ্যে একটা অন্য আনন্দ আছে। নীল আকাশে ভাসা পেঁজা তুলোর মতো সাদা সাদা মেঘ দেখার মধ্যে এক একাত্মতা আছে। এখনও ভারচুয়াল রিয়ালিটি অতটা এগোয়নি যে, প্রকৃতির সব কেড়ে নিয়ে যন্ত্রবন্দি করে ফেলবে।

নৈসর্গিক চিন্তা ছেড়ে আবার পার্থিব সমস্যায় মনকে ফিরিয়ে আনে অরিজিৎ। হ্যাঁ, এখানেই রিতাকে আসতে বলা যাবে। ময়দানের দক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় গেটটা দিয়ে ঢুকতে বলে দিতে হবে। তারপর দিঘির ধারে বেশ খানিকক্ষণ বসা যাবে। শেষে একটা ভারচুয়াল রিয়ালিটির হাতে টানা রিকশা ট্যুরও নেওয়া যাবে। হাতে টানা রিকশার একটা ট্যুর চালু হয়েছিল।

ময়দান এক পাক চল্লিশ লক্ষ টাকা। তা অত ভাড়া হলে কে আর টিকিট কাটবে? তাই চালু হবার মাস তিনেকের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল। এখন ভারচুয়াল রিয়ালিটি ট্যুর চালু হয়েছে। রিকশায় উঠে বসে মুখের ওপর একটা যন্ত্র টেনে নিলেই হল। ঝাঁকুনি খাওয়াতে খাওয়াতে ময়দানের চারপাশ দিয়ে একবার ঘুরিয়ে আনবে। অন্তত তা-ই মনে হবে। এটা কলকাতাতেই আছে। নিউইয়র্কে এখনও চালু হয়নি। রিতার বেশ ভালো লাগবে।

প্যান্ট ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল অরিজিৎ। ফোন করতে হবে রিতাকে। পার্কের বাইরেই একটা টেলিফোন বুথ আছে। মোবাইল ফোনটা আজ ওর সঙ্গে নেই। ওটাও মানিব্যাগে ছিল। অগত্যা ফোন বুথই ভরসা। বুথের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকামাত্র ওর খেয়াল হল ফোন যে করবে, পয়সা কোথায়? ক্রেডিট কার্ডটাও তো মানিব্যাগেই রয়ে গেছে। একটা উপায় আছে, টেলিফোন কোম্পানিকে ফোন করে রিতাকে লাইন দিতে বলা, আর বলে দেওয়া যে ফোনের চার্জ রিতা দেবে, ও নয়। ফোন কোম্পানির হেলপ্ লাইনে ফোন করতে কোনো পয়সা লাগে না, এই যা বাঁচোয়া। ফোন তুলে মিনিট তিনেক গান শুনল অরিজিৎ। তারপর মসৃণ মহিলা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, প্লিজ পুট ইওর জেনেটিক কোড কার্ড ইন দ্য স্লট। সর্বনাশ, এতেও কার্ড লাগবে। অবশ্য লাগারই কথা। সবরকম তথ্য তো কার্ডেই আছে। অর্থাৎ অরিজিৎ কোথায় থাকে, কোথায় কাজ করে, পাসপোর্ট নম্বর কত, বিবাহিত কি অবিবাহিত, বাবা, মা, স্ত্রীর নাম, বাসস্থান কোথায়, বাড়ির ফোন নাম্বার সব ওই কার্ড স্ক্যান করলেই বেরিয়ে যাবে। তাই ওদেরও জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করতে হয় না। রেগে একটা গালাগাল করতে গিয়েও অরিজিৎ থেমে গেল। আস্তে ফোনটা রেখে দিল। চারদিকে অজস্র ভিডিয়ো ক্যামেরা লাগানো আছে। এসব ক্যামেরা এত ছোটো যে খালি চোখে দেখাও যায় না। কোনোটাতে গালাগাল রেকর্ড হয়ে গেলে সে এক বিশ্রী কাণ্ড। ঠিক ওরা খুঁজে বার করবে। তারপর বাড়িতে চিঠি আসবে, তোমার চরিত্র রেটিং ৯৩০ থেকে কমে ৯২০ হয়ে গেছে। এই রেটিং জেনেটিক কোড কার্ডেই লেখা থাকে। কোনো দোকানে কিছু কিনতে গেলে জেনেটিক কোড কার্ড স্ক্যান করার

সঙ্গোসঙ্গো দোকানি তোমার রেটিং জেনে যাবে। তোমার স্বভাব-চরিত্র ব্যবহার সব এই কার্ডবন্দি। অনেক দোকানে ৯৫০-এর বেশি রেটিং-এর জন্য আলাদা লাইনের বন্দোবস্ত থাকে। সে লাইনে সব থেকে সুন্দরী রোবটেরা থাকে। লাইনে দাঁড়াতেও কম হয়। অনেক সুপারমার্কেটে তো ৬০০-র কম রেটিং থাকলে ঢুকতেও দেয় না। অরিজিতের এক বন্ধু মনোতোষ খুব রগচটা। প্রায় রোজই কারো না কারো সঙ্গো ঝগড়া বাধাত। ওকে এখন চরিত্র সংশোধনের ক্লাস করতে হচ্ছে। রেটিং চারশোর নীচে নেমে গেলে এ ক্লাস বাধ্যতামূলক। তা ক্লাস করে প্রচুর উন্নতি হয়েছে মনোতোষের। সব সময়ে মুখে হাসি—বিশুদ্ধ ভালো ভালো কথা। তা সেদিন অরিজিৎ মনোতোষকে সেকথা বলেও ছিল। মনোতোষ মুখ হাসি হাসি রেখে অরিজিতের কানে কানে বলেছিল, দাঁড়া, ছ-শো রেটিংটা পেয়ে নিই। আপাতত সঙ্গো একটা মিনি কম্পিউটার নিয়ে ঘুরছি, গালাগাল এলেই মুখে না বলে তাতে লিখে রাখি। খানিকটা রাগ কমে।

তা মনোতোষের গালাগাল প্রসঙ্গা এখন থাক। এ সংকট মুহূর্তে আর কিছু না ভাবাই ভালো। অরিজিৎ খানিকক্ষণ ভেবে অফিসের দিকে হাঁটতে শুরু করল। অফিসে গিয়ে মনোতোষ বা পার্থ কাউকে নিয়ে থানায় যাবে। এই ২২৩০ সালে অরিজিতের সব থেকে ভয় থানা পুলিশকে। পুলিশ মানেই মাথামোটা। অবশ্য রোবটদের কাছ থেকে আর কী-ই বা আশা করা যায়। মানুষ আর ক-জনই বা আছে ওই বিভাগে। রুটিনে বাঁধা কাজ, প্রচণ্ড পরিশ্রমী হতে হবে। সৎ হতে হবে, অত্যন্ত কাজের চাপেও মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে, ব্যবহার ভালো হতে হবে। রোবটরা এ সব ব্যাপারেই মানুষদের টেক্কা দেয়। তাই কিছু স্পেশাল ডিপার্টমেন্ট ছাড়া পুলিশের সব ডিপার্টমেন্টই রোবটে ছেয়ে গেছে। অরিজিতের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে বিশেষ ভালো নেই। এই তো এক বছর আগের ঘটনা। ও মোটরওয়ে ধরে বহরমপুর থেকে মালদা যাচ্ছিল। রাত বারোটা। ছ-লেনের ফাঁকা রাস্তা। কিন্তু প্রতি ঘণ্টায় তিন-শো মাইলের বেশি গতিবেগে চালানো যাবে না। তবু সুযোগ বুঝে অরিজিৎ ওর ‘ভারতদর্শন’ গাড়িটা চার-শোতে মিনিট পাঁচেক চালিয়েছিল। হঠাৎ ঝপাৎ করে কোথা থেকে পুলিশের গাড়ি এসে ওকে মোটরওয়ে থেকে সরে একধারে দাঁড়াতে বলল। আলো

ঝলমল পুলিশের গাড়ি থেকে একটা রোবট পুলিশ নেমে এল। কী মিষ্টি ব্যবহার! একমুখ হাসি নিয়ে বলল—স্যার আপনার লাইসেন্স আর কোড কার্ডটা একটু দেখতে পারি কি?

অরিজিৎ দুটোই বাড়িয়ে দিল। লাইসেন্স আর কোড নিয়ে রোবটটা নিজের গাড়িতে গিয়ে একটু পরে ফিরে এল। দুটোই ফেরত দিয়ে বলল—আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ স্যার। আপনার লাইসেন্সটা এক মাসের জন্য অকার্যকরী করে দিয়েছি। আর এক লক্ষ টাকা ফাইন হিসেবে আপনার কার্ডের ওপর চার্জ করেছি।

হতবাক অরিজিৎ চিৎকার করে উঠেছিল—কিন্তু আমি এখন যাব কী করে? লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালাব কী করে?

রোবট পুলিশটা হাসি হাসি মুখে বলে উঠল—এখান থেকে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য এয়ার ট্যাক্সি বলে দিয়েছি। আর দু-মিনিটের মধ্যেই এসে যাবে। গাড়ি আমরা পরে আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব—বলে হাত বাড়িয়ে অরিজিতের অচল হাতটা ধরে হ্যান্ডসেক করে আবার বলল—শুভরাত্রি স্যার, আবার দেখা হবে।

পুলিশের ব্যবহারই এরকম। অনুরোধ, উপরোধ, কাকুতি-মিনতিতে কোনো কাজ হয় না। শুধু নিয়ম আর নিয়ম। এসব ভাবতে ভাবতে অরিজিৎ অফিসের দিকে এগিয়ে চলল। পকেটে পয়সা নেই বলে বাস-ট্যাক্সির দিকে না তাকিয়ে হেঁটেই চলল চলন্ত ফুটপাথ ধরে। আজকাল রাস্তায় কেউ হাঁটলে লোকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। ভাবে আমেরিকা-ইংল্যান্ড থেকে ইল্‌লিগ্যাল ইমিগ্র্যান্ট এসেছে বুঝি। নাকি রাস্তায় হেঁটে শরীরচর্চা করছে। শরীরচর্চার ভঙ্গিতেই দ্রুত হেঁটে অরিজিৎ মিনিট কুড়ির মধ্যেই অফিসের সামনে পৌঁছে গেল। ঢোকার উপায় নেই। গেটে জেনেটিক কার্ড ঢোকালে তবেই গেট খুলবে। তাই গেটে লাগানো ভিডিয়ো ফোন থেকেই ফোন করল পার্থকে—অ্যাই আমি অরিজিৎ বলছি, একটা বড়ো সমস্যায় পড়েছি। একটু বেরিয়ে আসবি?

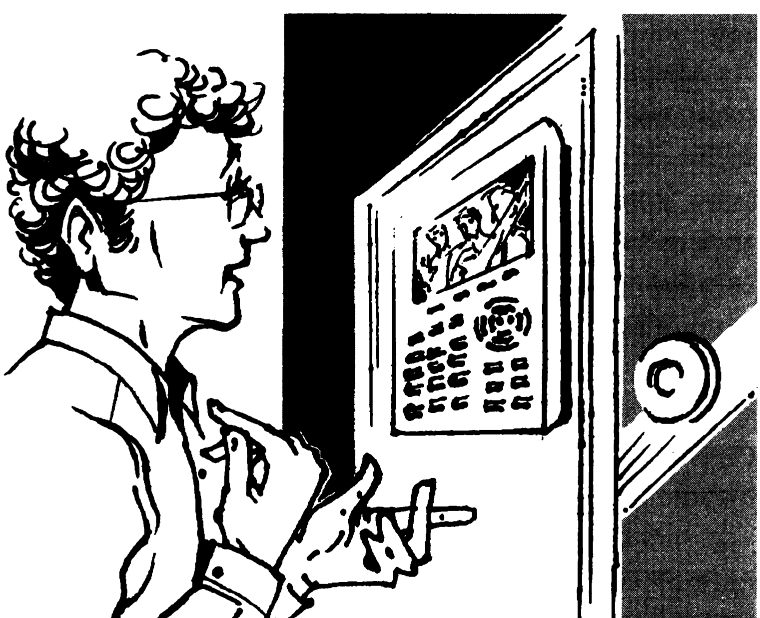
—তা ভেতরে আয় না, বাইরে কথা বলার কী দরকার?

—আরে সেটাই তো মুশকিল হয়েছে। আমার জেনেটিক কার্ড দুটোই গেছে হারিয়ে।

—সর্বনাশ! দাঁড়া আমি আসছি।

পার্থ অরিজিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অন্য কাউকে বললে বিশ্বাস নাও করতে পারে। কিন্তু পার্থ নিশ্চয়ই ওর গলা চিনেছে। আজকের যুগে মুখ দেখে কাউকে চেনা যায় না। অরিজিৎকে দেখতে বিশ্ববিখ্যাত লেখক মনোজ লাহিড়ীর মতো। অরিজিতের মা-বাবা ওঁর লেখার দারুণ ভক্ত ছিলেন। তাই অরিজিৎ হল মনোজ লাহিড়ীর ক্লোন (clone)। এখন অরিজিতের বাবা-মাই তো একমাত্র ভক্ত ছিলেন না। সারা পৃথিবী জুড়ে তাই প্রায় পঞ্চাশ হাজার মনোজ লাহিড়ীর ক্লোন আছে। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে দেখতে প্রায় অবিকল অরিজিতের মতোই। তাই মুখ বা চেহারা দেখে অরিজিৎকে অরিজিৎ বলা যায় না, বলতে হবে ওর গলা শুনে, ওর হাঁটাচলা, ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা দেখেশুনে।

পার্থকে ফোন করার পর প্রায় পনেরো মিনিট কেটে গেল। কোনো সাড়াশব্দ নেই। আরেকবার ফোন করল অরিজিৎ। এখন ওদিকে শুধু



পার্থ একা নয়, পার্থ, অমিত আর মনোতোষ। তিনজনের মুখই বেজায় গম্ভীর।

—কী ব্যাপার অনেকক্ষণ হয়ে গেল বাইরে এলি না যে।

পার্থই গলা খাঁকড়ে বলে উঠল—একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তুই মানে আপনি কে তা শিয়োর না হয়ে আমরা বেরোতে পারছি না। আর দু-তিন মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে যাবে। আমরাও তখন বেরিয়ে আসব।

—কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমিই তো অরিজিৎ। কি আমার গলা শুনে বুঝতে পারছিস না। আচ্ছা, কাল আমরা সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় অফিস থেকে বেরিয়েছি। অমিতের সঙ্গে চাঁদে বাড়ি কেনা নিয়ে কথা হচ্ছিল, তুই বলছিলি চাঁদের থেকে মঙ্গলে ইনভেস্ট করা ভালো।

এবার অমিত বলে উঠল—আমরা তো বুঝতে পারছি যে তুই-ই অরিজিৎ। কিন্তু আমাদের বেরোতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। ওরা এসে যাক, তখনই বুঝিয়ে বলা যাবে।



অরিজিৎ উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু চারদিকে পুলিশের গাড়ির অ্যালার্ম শুনে আর কিছু বলল না। চারটে পুলিশের গাড়ি ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এর আধঘন্টা পরের কথা। অরিজিৎ থানায় বসে আছে। ওকে ঘিরে মি. প্রদীপ শাসমল—গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান, চারজন সশস্ত্র রোবট পুলিশ, অমিত, মনোতোষ, পার্থ আর মি. রাজশেখর রেড্ডি—অরিজিতের কোম্পানির পার্সোনেলের হেড। ভিডিয়ো কনফারেন্সে রিতাও আছে। অরিজিতের প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছে। অরিজিৎ এমন অনেক কথা বলেছে যা রিতা আর অরিজিৎ ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়। রিতা সেগুলো সমর্থন করেছে। একইভাবে অমিত, মনোতোষ আর পার্থও অরিজিতের সবকথায় সম্মতি জানিয়েছে। অবশ্য জোরালো প্রমাণ এখনও এসে পৌঁছোয়নি। ক-দিনের মধ্যেই সে প্রমাণ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ডি. এন. এ. টেস্টের রিপোর্ট। কম্পিউটার ডেটা বেসে অরিজিতের জেনেটিক কোড আছে। তার সঙ্গে মিললেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। ওর জেনেটিক কোড কার্ড হারিয়ে গেছে, এই মর্মে একটা বার্তা বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাকই এগোচ্ছে দেখে অরিজিতের বেশ নিশ্চিন্ত লাগছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই খারাপ খবরটা এল। শ্রীলঙ্কায় ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে গতকাল। তাতে জড়িত আছে ডেভিড নিল। ডেভিড নিলও মনোজ লাহিড়ীর ক্লোন। দেখতে অবিকল অরিজিতের মতোই। ডেভিড নিলের জানা আটটা ভাষার মধ্যে বাংলাও পড়ে। একথাটা জানার সঙ্গেসঙ্গে সবাই যেন একমুহূর্তে বদলে গেল। এমনকী রিতার চোখেও সন্দেহ। এই ২২৩০ সালে ইচ্ছে করলেই যে কেউ অন্য কারও যাবতীয় তথ্য জোগাড় করে নিতে পারে। অরিজিতের কথামতো কোড কার্ড হারিয়েছে সকাল সাড়ে ন-টায়, আর অরিজিৎ অফিসে এসেছে সাড়ে বারোটায়। অতক্ষণ তাহলে কাউকে জানায়নি কেন?

মি. শাসমলই প্রশ্নটা আবার করলেন রিতাকে—তাহলে কি আপনি নিশ্চিত যে ইনিই অরিজিৎ? একমাত্র আপনার কথায় বিশ্বাস করে ওঁকে আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে নিউইয়র্ক পাঠানো যেতে পারে।

রিতা একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মাথা নাড়ল—না।

মি. শাসমল আবার অরিজিতের দিকে ফিরলেন—দেখুন আমরা কেউ শিয়োর নই যে আপনিই অরিজিৎ। আপনাকে জেরা করতে চাইছে শ্রীলঙ্কা পুলিশ। ওরা জানতে চায় আপনিই ডেভিড নিল কি না। তাই আপনাকে কয়েকদিন নজরবন্দি হয়ে থাকতে হবে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর বাইরে যেতে দেওয়া হবে না।

—আচ্ছা ঘনশ্যাম যদি আমাকে চিনতে পারে?

—কে? ঘনশ্যাম কে?

—আমার বাড়ির কাজের লোক। চোদ্দো বছর ধরে আমার কাছে আছে। এখানে উপস্থিত সবাই ওকে ভালো করে চেনে।

মি. শাসমল একটু ভাবলেন। তারপর বললেন—ঠিক আছে দেখাই যাক ঘনশ্যামকে ডেকে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই ভিডিয়ো কনফারেন্সে এসে গেল ঘনশ্যাম। ওকে মি. শাসমল পুরো ঘটনাটা বুঝিয়ে বললেন। ঘনশ্যাম কিছুক্ষণ অরিজিতের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলে উঠল—বাবু আপনাকে আজ আমি মানিব্যাগটা দিতেই ভুলে গেছি। ওটা তো বাড়িতেই রয়ে গেছে। হাসি হাসি মুখে ঘনশ্যাম মানিব্যাগটা তুলে ধরে।

আরও এক ঘণ্টা পরের কথা। অরিজিৎ বাড়িতে বসে চা খাচ্ছে। ঘনশ্যামের সাক্ষ্যে ও ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু ওর আর নিউইয়র্ক যাবার ইচ্ছা হয়নি। কী দরকার এমন একজনের সঙ্গে দেখা করবার, যে অরিজিৎকে এখনও চেনে না। অরিজিৎ ঘনশ্যামকে জিজ্ঞেস করে—তা ঘনশ্যাম, আমার জন্যে অন্য মানিব্যাগ দেখিয়ে অত বড়ো মিথ্যেটা বললি কেন? তুই তো ঠিকই জানতিস যে আমি মানিব্যাগ নিয়ে গেছি। ঘনশ্যাম কিছুই না বলে শুধু একগাল হাসে। অরিজিৎ জানে যে, অরিজিৎকে চেনার জন্য ঘনশ্যামের জেনেটিক কোড কার্ড লাগে না। ডি. এন. এ. টেস্টেরও দরকার পড়ে না। কী যুগ পড়েছে! মানুষকে মানুষ চেনে না, কিন্তু রোবট ঠিক চেনে।

পৃথিবী ছাড়ার দিন

আজ একটু তাড়াতাড়িই ঘুমটা ভেঙে গেল সদাশিববাবুর। আড়চোখে পাশে রাখা ঘড়ির দিকে তাকালেন। সাতটা বাজতে দশ। নিয়মমাফিক আরও দশ মিনিট ঘুমোনোর সময় আছে। ঠিক সাতটায় ভূতো এসে কানের কাছে মুখ এনে ডাক দেবে—বাবু উঠে পড়ুন। সাতটা বেজে গেছে।

প্রথম প্রথম সদাশিববাবু বেজায় খেপে উঠতেন। তার পিছনে অবশ্য কারণও আছে। ভূতোকে একটা কথা বলা মানেই ওর সঙ্গে আরও মিনিট পাঁচেক কথোপকথন চালাতে হবে। আর অত কথা যদি বলতেই হয় তাহলে আর ঘুমের বাকি কী থাকল! সদাশিববাবু হয়তো বললেন—দশ মিনিট বাদে উঠছি।

ভূতোর উত্তর হবে—শরীর খারাপ হল নাকি? ডাক্তার ডাকব?

—আরে না, না, শরীর খারাপ নয়। এমনি রাতে ভালো ঘুম হয়নি।

তখন চিন্তিত গলায় ভূতো বলে উঠবে—কী—ঘুম হয়নি কেন? রাতে খাওয়ার কিছু গন্ডগোল? নাকি বিছানা ঠিকভাবে করা হয়নি? নাকি—

সদাশিববাবু বিরক্ত হয়ে ভূতোকে থামিয়ে বলে উঠবেন—আরে না-না, সেরকম কিছু নয়। ঘুম মোটামুটি ঠিকই হয়েছে।

তখনকার মতো ভূতো হয়তো চুপ করল। সদাশিববাবু ফের চোখ বুজে আধভাঙা ঘুম জোড়া লাগানোর চেষ্টা করেন।

আবার ভূতোর গলা—দশ মিনিট দেরিতে ঘুম ভাঙা মানে অফিসে

বেরোতে দশ মিনিট দেরি। অফিস থেকে ফিরতে দশ মিনিট দেরি। রাতে ঘুমোতে দশ মিনিট দেরি। কাল সকালে উঠতে আবার দশ মিনিট দেরি। —কানের কাছে ভূতো বিড়বিড় করতে থাকে। কিছুতেই সময়ের হিসেব মেলাতে পারে না। এরকম জটিল সমস্যা সম্পর্কে কাকে কাকে জানানো দরকার সে প্রশ্নটা না করলেই নয়।

তাই ভূতো আবার জিজ্ঞেস করে—বাবু আপনার এই দেরির কথাটা কাকে কাকে জানাতে হবে?

উত্তর না পেয়ে ফের প্রশ্ন করে ভূতো, এবারও উত্তর নেই। আবার প্রশ্ন করে। এবার উত্তর পায়। বাবুর স্বাভাবিক শব্দমাত্রার থেকে অনেক বেশি জোরে—দরকার হলে আমিই জানাব, তোকে পাকামি করতে কে বলেছে? অহেতুক বাজে কথা বলে ঘুমের বারোটা বাজানো—বিছানা ছেড়ে উঠে জোরে পা ফেলে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যেতেন সদাশিববাবু। পরে মাথা ঠান্ডা হলে ভাবতেন ভূতোর আর কী দোষ! ভূতোকে তৈরিই করা হয়েছে ওইভাবে। এজন্যই তো ভূতো। X_1 ক্যাটাগরির রোবট। X_2 বা X_3 ক্যাটাগরির রোবটের দাম অনেক কম। তারা এত প্রশ্নও করবে না। যা বলা হবে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেবে। তাতে সুবিধে অসুবিধে দুই-ই আছে। তবু সদাশিববাবু প্রথমদিকে দু-তিন বার কমপ্লেন করেছিলেন ভূতো সম্বন্ধে। যেখান থেকে কিনেছিলেন তাদের কাছে। তারা সদাশিববাবুকে জানিয়েছিল যে X_1 রোবটকে চালানোর সবথেকে ভালো উপায় হল যতটা সম্ভব সম্পূর্ণ কথা বলা। কোনো পালটা প্রশ্নের অবকাশ না দেওয়া।

তারপর থেকে সদাশিববাবু ঘুম থেকে দেরি করে ওঠার একটা সহজ উপায় বার করেছেন। যেদিন উঠতে ইচ্ছে না হয় চোখ না খুলে মন্ত্রের মতো বলে যান, আমি পনেরো মিনিট দেরিতে উঠব, দেরির পিছনে কোনো স্বাস্থ্যগত, মানসিক বা অনিদ্রাজনিত কারণ নেই। এ বিষয়ে কাউকে কিছু জানানোরও দরকার নেই কারণ এই সামান্য দেরির জন্য কোনো কিছু বিঘ্নিত বা বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা নেই।

এরপর আর ভৃত্যের কাছ থেকে কোনো প্রশ্ন আসে না। সদাশিব বাবুও খুশি, ভূতোও নিশ্চিন্ত। তা এসব নব্বই বছর আগেকার কথা। তখন



ভূতো সবে সদাশিববাবুর বাড়ি এসেছে, এখন X_1 ক্যাটাগরির রোবট রীতিমতো অ্যান্টিক হয়ে গেছে। মিউজিয়াম ছাড়া দেখাই যায় না। বিভিন্ন আপগ্রেড বা পরিবর্তনের অফার এসেছে। কিন্তু সদাশিববাবুর এটাই স্বভাব। কোনো কিছু পরিবর্তন করা বা ফেলে দেওয়া ওঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আর ভূতোকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আনার কথা তো ভাবাই যায় না। হতে পারে তারা অনেক বেশি বুদ্ধিমান, অনেক চটপটে, কিন্তু সদাশিববাবুর জন্য ভূতোই যথেষ্ট। ভূতো সদাশিববাবুর ফ্যামিলি মেম্বার।

ভূতোকে দেখতেও বেশ মিষ্টি। এখনকার রোবটগুলোকে তো আর রোবট বলা চলে না। মানুষ না রোবট দেখে বোঝাই মুশকিল। হিউম্যানয়েড রোবট। পায়ের চামড়াও মানুষের মতো। ভূতোকে দেখে সেরকম ভুল হওয়ার কোনো কারণ নেই। চৌকো ভ্যাবা-ক্যাবলা মুখ। গায়ে টোকা মারলে টং-টং আওয়াজ হয়। দিব্যি জিনিস।



এসব ভাবতে ভাবতে সাতটা কখন বেজে গেছে সদাশিববাবু খেয়াল করেননি। ভূতো কোথায়? ডাকতে এল না তো? মাথা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে অবশেষে ভূতোকে দেখতে পেলেন সদাশিববাবু। বাইরের বারান্দায় চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে ভূতো। কী ব্যাপার? শরীর খারাপ হল নাকি? ভেবে নিজের মনেই হেসে নিলেন সদাশিববাবু। ভূতো যতই আপনার হোক, মানুষ তো নয়। রোবটের আবার শরীর খারাপ। নির্ঘাত টেবিলঘড়িটার সময় এগিয়ে আছে। ভূতো ঠিক সময়মতো ডাকবে।

আজকের দিনটা সদাশিববাবুর কাছে বিশেষ দিন। আজকেই উনি মঙ্গলে পাড়ি দেবেন। পৃথিবীতে আজই ওঁর শেষ দিন। আর কোনোদিন ফেরা হবে মনে হয় না। মঙ্গলে পাড়িটা অবশ্য স্বেচ্ছায় নয়। এটাই এখনকার আইন। বয়স দেড়-শো ছাড়লেই মঙ্গলে যেতে হবে। বাকি

জীবনটা সেখানেই কাটাতে হবে। নিয়মটার পিছনে অনেক কারণও আছে। এখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের এতটাই উন্নতি হয়েছে যে, ২০০ বছর বয়সের আগে মৃত্যুই অস্বাভাবিক। পৃথিবীতে আর কত লোক ধরবে? দু-শো বছর আগে যেখানে থাকার কথা ভাবাই যেত না, সেখানেও এখন জায়গা মেলা ভার। এই তো কয়েকদিন আগেকার কথা। সাহারা মরুভূমিতে একটা বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। ২০,০০০ ফ্ল্যাট হবে। আকাশছোঁয়া দাম। তবু অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে চোদ্দো লক্ষ।

সবাই পৃথিবীতে থাকতে চায়। চাঁদ, মঙ্গল বা বুধে জমি কত সস্তা। তবু সেখানে কেউ যাবে না। অবশ্য তার পিছনে একটা বড়ো কারণ, মানুষ কাচের ঘরের মধ্যে জীবন কাটাতে চায় না। চাঁদ, মঙ্গল বা বুধে বিশাল, বিশাল কাচের ঘর, একেকটা ঘর কয়েক-শো স্কোয়ার মাইল জুড়ে, তার মধ্যে কৃত্রিমভাবে পৃথিবীর মতো আবহাওয়া তৈরি করা হয়েছে। সব কিছুই আছে পৃথিবীর মতো। শুধু নীল আকাশ নেই। মেঘের আনাগোনা নেই। এসব ঘরের বাইরে স্পেসস্যুট না পরে বেরোবার উপায় নেই, এসবের জন্য এখনও কেউ নেহাত বাধ্য না হলে পৃথিবীর বাইরে পা রাখতে চায় না।

তাই দেড়-শো বছরের বেশি বয়সিদের জন্য চাঁদে আর মঙ্গালে তৈরি হয়েছে বিশাল বিশাল বৃদ্ধাবাস। সেখানে অবশ্য সবরকমের সুযোগ-সুবিধে আছে। পৃথিবীর ভার্চুয়াল ট্রিপও আছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে না এলেও সেসব ট্রিপ নিলে মনে হবে পৃথিবীতেই এসে পড়েছি।

এসবই অবশ্য শোনা বা পড়া কথা। নিজে তো আর বেড়াতে যাননি সদাশিববাবু। সেরকম শখও হয়নি কোনোদিন। বিছানা ছেড়ে চেয়ার টেনে বারান্দায় গিয়ে বসলেন সদাশিববাবু। শেষবারের মতো যতটা সম্ভব দু-চোখ ভরে দেখে নেওয়া যাক পৃথিবীর রূপসজ্জা। সামনের অশ্বত্থ গাছে কাকেরা বাসা করছে। সম্প্রতি তিনটে বাচ্চা হয়েছে। তাই মা কাক সবসময় পাহারা দিচ্ছে। চেনা দৃশ্য। তবু অজান্তে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল সদাশিববাবুর। আর দু-ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবীর মাটি ছাড়তে হবে। পৃথিবী থেকে চাঁদের স্পেস স্টেশনে। তারপর একমাস পরে যখন পৃথিবী থেকে মঙ্গালের দূরত্ব সবথেকে কম হবে তখন চাঁদ থেকে মঙ্গাল যাত্রা! মঙ্গালে পৌঁছোতে আরও তিন মাস। এত দীর্ঘ ভ্রমণের কোনো অভিজ্ঞতা নেই সদাশিববাবুর। কীভাবে এতদিন মহাকাশযানে

কাটাবেন কে জানে! তবে বাড়ির মাস্টার কম্পিউটারটা বলছিল, বেশিরভাগ সময়ই নাকি ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। ভার্চুয়াল রিয়ালিটির সাহায্যে মহাকাশযান এমন পরিবেশ তৈরি করা হয় যাতে মনে না হয় মহাকাশযানে আছি। অতটা সময় কাটাতেও কোনো অসুবিধে হয় না। হবে হয়তো।

—বাবু, চা দেব?—ভূতোর গলা।

—হ্যাঁ, দে। তা কী হল, আজ ডাকলি না যে সকালে?

—ভাবলাম কাল শুতে আপনার রাত হয়েছে, তাই।—ভূতো বলে ওঠে।

—বাহ, তোর তো বেশ বুদ্ধি হয়েছে।—ধরা গলায় বললেন সদাশিববাবু।

কাল রাতের অভিজ্ঞতাটা আদৌ সুখপ্রদ নয় সদাশিববাবুর। ওঁর এক ছেলে সুসময়। তার আবার এক ছেলে, এক মেয়ে। তাদের আবার নাতি-নাতনি সব বড়ো হয়ে গেছে। তারা ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে। কেউ টোকিও, কেউ সাংহাই তো কেউ ডাবলিনে। সদাশিববাবু যতটা পারেন চেষ্টা করেন সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। দেখাসাক্ষাৎ তো হয় না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ দিনকে উপলক্ষ্য করে ই-কার্ড ছাড়তে ভুল করেন না। সময়মতো কিছু পানও। গতকাল সবাইকে একজায়গায় জড়ো করতে চেয়েছিলেন সদাশিববাবু। পৃথিবী ছাড়ার আগে সবাইকে একবার চোখের দেখা আর কি। জানেন কারওরই এসবের সময় নেই। এসব পুরোনো আবেগেরও জায়গা নেই আজকের জীবনে। তুবও, মাসখানেক ধরে চেষ্টা করে গেছেন যাতে কালকের দিনে সবাই একজায়গায় ডেকে আনা যায়। শেষপর্যন্ত কেউই আসেনি। এসেছে একগাদা ই-কার্ড। নানান অজুহাত দেখিয়ে। এমনকী সুসময়, সদাশিববাবুর একমাত্র ছেলে, সেও বাবার সঙ্গে দেখা করার সময় পায়নি। এসব ভেবে কাল শুতে অনেক রাত হয়ে গেছে সদাশিববাবুর। সময় যত এগিয়েছে প্রযুক্তি মানুষের মধ্যে দূরত্ব তত বাড়িয়ে দিয়েছে। কমায়নি। চোখের কোণে জল মুছে ফেললেন সদাশিববাবু। সুসময়কে শেষ দেখেছেন তা প্রায় চার বছর হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে। ভূতোর হাত থেকে চা নেওয়ার সময় বেশ খানিকক্ষণ ভূতোর দিকে তাকিয়ে রইলেন সদাশিববাবু। একহাতে চা নিয়ে

অন্য হাত দিয়ে সস্নেহে ভূতোর হাতটা ধরলেন। মঙ্গালে একাই যেতে হবে। ওখানে ভূতোকে নেওয়ার উপায় নেই। ফ্যাক্টরির লোক এসে ভূতোকে নিয়ে যাবে। আপগ্রেড করে আধুনিক কোনো রোবট বানাবে। সদাশিববাবুর বুকটা কেমন যেন করে উঠল।

এ মুহূর্তে আর কাউকে ছেড়ে যেতেই ওঁর ততটা কষ্ট হচ্ছে না, যতটা হচ্ছে ভূতোকে ছেড়ে যেতে। এই নব্বই বছরের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নার একমাত্র সঙ্গী ভূতো। কান্না আর থামাতে পারলেন না সদাশিববাবু, ভূতোর লোহার আঙুলগুলো ওঁর চোখের জলে ভিজে উঠল।

—বাবু, আপনার শরীর কি খারাপ?

—হ্যাঁ, খুব খারাপ। যা ডাক্তারবাবুকে ডাক, বল এমন ওষুধ দিতে যাতে আরও কয়েকদিন এখানেই থাকতে পারি।

ভূতো কী বলবে কিছুই বুঝে ওঠে না, তবে চোখে-মুখে খুশির ছাপ ফুটে ওঠে। সদাশিববাবু ফের বলে ওঠেন—আর ব্যাগ খুলে সব জিনিসপত্র বার করে দে। আজ আমি মঙ্গালে যাচ্ছি না, আমার শরীর খুব খারাপ।

—বাবু, সে তো আমি প্যাকই করিনি।

—সে কী রে! তুই কি আজকাল নিজের বুদ্ধিতে চলছিস? কাল যে তোকে বললাম, আজ সকাল সকাল সবকিছু প্যাক করে রাখতে।

—তারপর যে আপনি টেলিফোনে ওদের বললেন।

—কাদের? কী বললাম?

—ওই যারা আমাকে বানিয়েছে। বললেন যে, কালকেই আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে। বললেন, আজ থেকে আর আমাকে লাগবে না। তা আমি তাহলে তো আর আপনার কথা শুনতে বাধ্য নেই, আজ থেকে আমি স্বাধীন।

সদাশিববাবু অবাক হয়ে ভূতোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখ চকচক করে উঠল। ভূতোও কি তা হলে অভিমান করতে জানে। ভালোবাসতে জানে। হবে হয়তো। ভূতো কি তাহলে মানুষের সঙ্গো থাকতে থাকতে মানুষের মতো হয়ে উঠেছে? ভেবেই লজ্জা পেলেন সদাশিববাবু। বলা উচিত মানুষের মতো হয়ে ওঠেনি।

ফিরে এল অনুপম

গ্রামের নাম বেলপাকুড়ী। এমন অদ্ভুত নাম, কে দিয়েছিল কে জানে। এ গ্রামের সঙ্গে আমার পরিচয় একটা বিয়ের সূত্রে। মাসতুতো ভাইয়ের ছেলের বিয়ে। না গেলেই নয়। কলকাতা থেকে যারা আসবার তারা বরযাত্রীর বাসে আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। বেলা দুটোয়। আমার অফিস। পাঁচটার সময় বেরোনোর প্ল্যান থাকলেও বেরোতে বেরোতে ঠিক ছ-টা হয়ে গেল। গাড়ি নিয়ে পৌঁছেই হাইরোড ধরে কোলাঘাট। তারপর বাঁ-দিক ঘুরে সোজা দিঘা যাবার রাস্তায়। তা, সেও প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেছে, বড়ো রাস্তা ছেড়ে সরু রাস্তা ধরেছি।

ভেবেছিলাম রাত ন-টা নাগাদ বিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ব। আর এখন রাত সওয়া ন-টা। পৌঁছোলামই না। নরঘাটের পর থেকে জঘন্য রাস্তা শুরু হয়েছে। রাস্তা জুড়ে বিশাল বিশাল গর্ত। ঝাঁকুনিতে কোমর ব্যথা হয়ে গেল। গাড়ি সাইকেলের গতিতে চলছে। ভুলটা আমারই, অন্তত আজকে তাড়াতাড়ি বেরোনো উচিত ছিল।

শেষ লোকটাকে দেখেছি মিনিট দশেক আগে। এখন একজনকে পেলে ভালো হত। জিজ্ঞেস করে নিতাম ঠিক দিকে যাচ্ছি কি না। পথ হারালে আজ ফেরাই দায় হবে। আর অজয়েরও বলিহারি, ছেলের বিয়ে দিবি তো দিবি, এরকম আঘাটায়! তাহলে ছুটির দিনে বিয়ে দিলে হত।

ড্রাইভার হঠাৎ গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। সামনে একটা আম গাছের নীচে একটা লোক দাঁড়িয়ে। বছর তিরিশের মধ্যে বয়স। সাদা পায়জামার

ওপর সবুজ পাঞ্জাবি। গায়ে মেরুন রঙের শাল জড়ানো। ছোটোখাটো চেহারা, একটু ভারীর দিকে।

—দাদা শুনছেন, নতুন বাগানের মোড়টা কোন দিকে বলতে পারেন? —ড্রাইভার গাড়ির কাচ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল।

লোকটা গাড়ির দিকে এগিয়ে এল—আপনারা পথ ভুল করেছেন। আগের মোড় থেকে ডান দিকে বেঁকে যেতে হত। এখান থেকে মিনিট কুড়ির রাস্তা। তবে আজ তো ওদিকে যেতে পারবেন না। সন্ধ্যে ছ-টার সময় বাস অ্যাক্সিডেন্টে একটা স্থানীয় ছেলে মারা গেছে। এখন পথ অবরোধ।

—তবে?—আমি আর আমার ড্রাইভার অসীম মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।—কিন্তু ওখানে যে আমাকে আজকে পৌঁছোতেই হবে। বিয়ে বাড়ি আছে।

—বুঝেছি, স্যান্যালদের বাড়ি তো? বীণা, মানে যার বিয়ে হচ্ছে তার দাদা আর আমি ছোটোবেলার বন্ধু। নাহয় আমাদের বাড়িতেই চলুন। পথ অবরোধ সরলে রওনা হয়ে যাবেন।

—কিন্তু আমাকে যে আজ রাতেই আবার কলকাতা ফিরতে হবে।

—সে আপনি এমনিতেও ফিরতে পারবেন না। আর এদিকের পথটাও ভালো নয়। রাতের দিকে প্রায়ই ডাকাতি হয়।

—তা আপনার নামটা।

—বিদ্যুৎ।

শেষপর্যন্ত বিদ্যুতের পীড়াপীড়িতে রাজিই হতে হল। ঠিক হল পথ অবরোধ না ওঠা পর্যন্ত ওর বাড়িতেই অপেক্ষা করব। নেহাত যদি অবরোধ না ওঠে তাহলে আজ রাতটা বিদ্যুতের বাড়িতে কাটিয়ে কাল সকালে একবার অজয়দের সঙ্গে দেখা করে কলকাতা ফিরব। তা ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে? সেলফোনের নেটওয়ার্ক নেই যে ফোন করে কিছু ব্যবস্থা করব।

রাস্তার পাশেই বিদ্যুতের বাড়ি। একফালি জমির মাঝে একতলা বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকে দু-ধারে ফুলগাছের মধ্যে দিয়ে একচিলতে মাটির রাস্তা। সেটা পৌঁছেছে বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত। বিদ্যুৎ একাই থাকে। সঙ্গী বলতে একটা চাকর। থাকার ঘরের অভাব নেই। তিনটে মাঝারি সাইজের ঘর। এ

ছাড়া বসার ঘর, রান্নাঘর আর বাথরুম। সব ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ। বিদ্যুৎ নিজে থেকেই বলে উঠল—উত্তর দিকে একটা পুকুর আছে। ঠান্ডা হাওয়া আসে। তাই সন্ধ্যা হলেই জানলা-দরজা বন্ধ রাখি।

—তুমি আমার থেকে বয়সে অনেক ছোটো। 'তুমি' বলেই বলছি কোনো আপত্তি নেই তো?

—না, না—তুমি-ই বলুন। আমারই অস্বস্তি হচ্ছে।

—তোমার বাবা-মা?

—দু-জনেই মারা গেছেন। বহু বছর। দাদু ছিলেন, তা উনিও গত হয়েছেন বছর পাঁচেক হল।

—তা, বাড়ির সঙ্গে তো বাগানও আছে, তাই না?

—হ্যাঁ, দাদুর খুব বাগানের শখ ছিল। আমিও দাদুর সঙ্গে থেকে থেকে বাগানের সব কাজ করতাম। আমি আর নবিই এখন দেখাশোনা করি। জায়গাটা যে খুব বড়ো তা নয়। আট কাঠার মতো।

—তা, কী কী গাছ আছে?

—ওদিকটায় আম, জাম, পেয়ারা, লেবু আর এদিকটায় সবজির বাগান। বাঁধাকপি, ফুলকপি, বিট, গাজর, আলু, কড়াইশুঁটি, পেঁয়াজ কী চাই বলুন। ফুলের বাগানও আছে। জবা, টগর থেকে শুরু করে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, দোপাটি, রজনীগন্ধা পর্যন্ত।

—তাই বুঝি? আচ্ছা বাগানটা একবার ঘুরে দেখা যায় না?—অসীম বলে।

—অবশ্যই। নবি! নবি!

—একজন ষণ্ডামার্কা চেহারার লোক ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ডাকাত ডাকাত চেহারা। —বাবুদের একটু বাগান থেকে ঘুরিয়ে আনো তো। আলো জ্বেলে নিয়ো।

—না, না, আমি যাব না। এত রাতে এতটা জার্নি করার পর আমার আর উৎসাহ নেই। আমি এখানেই বসছি। অসীম তুমি দেখে এসো। —আমি বললাম।

অসীম আর নবি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—আপনি তো লেখক। আপনার লেখাতে তো গাছপালা গ্রামের

পরিবেশ বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে থাকে। কিন্তু এসব দেখতে আপনার কোনো উৎসাহ নেই?

—ওসব লেখার জন্য। সবকিছু দেখে লিখতে হবে নাকি! এই ঠান্ডাতে বাইরে বেরিয়ে শরীর খারাপ করার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। কিন্তু তুমি আমাকে চিনলে কী করে?

—আপনাকে কে না চেনে? এই তো গত পরশুই আপনার এক সাক্ষাৎকার হয়ে গেল টিভিতে। আর আমি আপনার লেখা গল্পের নিয়মিত পাঠক।



—ও তাই বুঝি? এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! এত দূর এসেও যে আমার এক পাঠক খুঁজে পাব তা ভাবতেই পারিনি।

বিদ্যুৎ মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল—আপনি বসুন। আমি আপনার চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।

নাহ্, চা-টা খেয়েই আবার রওনা হতে হবে। অচেনা-অজানা একজনকে এতরাতে এসে এরকম বিড়ম্বিত করা আদৌ উচিত নয়। অবরোধ হয়তো এতক্ষণ উঠে গেছে। ওঠার জন্য উদ্যোগ করছি, চোখ পড়ল বইয়ের আলমারিতে, 'উত্তর না পেয়ে', 'এই পৃথিবী', 'পথ হারিয়ে'



পরপর আমার উপন্যাসগুলো। নাহ্ অনেক লিখে ফেলেছি গত তিরিশ বছরে। কিছু ভালো লিখেছি, কিছু খারাপ। লিখেছি সবরকম পাঠকের জন্য। আমাকেই যদি আমার বইগুলো পড়তে দেওয়া হয়, জীবনের বাকি ক-বছরে পড়ে উঠতে পারব কি না সন্দেহ।

বুক কেসের তৃতীয় ধাপে পরপর রাখা অনুপম অমনিবাস কলকাতার নামি একটা প্রকাশনী থেকে বারো খণ্ডে আমার যাবতীয় অনুপম কাহিনি নিয়ে একযোগে বার করেছে, বেশ সুন্দর করেছে বইগুলো, দেখলেই হাত বোলাতে ইচ্ছে করে। বুককেস খুলে একটা খণ্ড বের করলাম। হাত দিয়েই বুঝলাম শুধুমাত্র সাজিয়ে রাখার জন্য এগুলো কেনা হয়নি। নিয়মিত নাড়াচাড়া হয়। উৎসর্গের খাতায় নীল কালিতে লেখা কথাগুলো ভারি অদ্ভুত—'বিদ্যুৎ তোমার জীবনের পথচলার নিত্য সঙ্গী হোক আদর্শ আর সততা। দুর্বলকে গরিবকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও—অনুপম দা'।

বইটার পাতা উলটে দেখছি, হঠাৎ দরজার কাছে বিদ্যুতের গলা শুনলাম—বইটা চেয়ে নিলেই পারতেন। দেখবেন, ছেঁড়ে না যেন, আমি আমার বই কাউকে পড়তে দিই না।

চায়ের ট্রে-টা সামনের টেবিলের ওপরে রেখে বিদ্যুৎ বলে উঠল—দিন, বইটা রেখে দিই।

বইটা ভয়ে ভয়ে বাড়িয়ে দিলাম। বইটা হাতে নিয়ে বিদ্যুৎ তার মলাটের ওপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে আবার বইয়ের আলমারির যথাস্থানে রেখে দিল।

আশ্চর্য, আমি কখনো আমার পাঠকের কাছে এরকম ব্যবহার পাইনি। এরকম অবস্থায় তারা হয়তো কৃতার্থ হয়ে বলে উঠত—আমার কী সৌভাগ্য যে আপনি বইটাতে হাত দিলেন! দয়া করে বইতে একটা সই করে দেবেন?

আর এ তো রীতিমতো কেড়ে নিল।

—আচ্ছা, পথ অবরোধ কি উঠে গেছে?

—না, আমি খবর পেলেই আপনাকে জানাব, চিন্তা করবেন না, অসীমদাকে নিয়ে নবি বড়ো রাস্তাতেই গেছে খোঁজ নিতে।

একটু সাহস করে বলে উঠলাম—আচ্ছা, দেখলাম অনুপমদা বলে একজন আপনাকে বইটা উপহার দিয়েছেন। তিনি কে?

—কে আবার! আপনার গল্পের নায়ক অনুপম রায়চৌধুরী।

—আমি জোরে হেসে উঠলাম।

—এতে তো হাসির কিছু দেখছি না।—বিদ্যুতের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

—না, মানে—অনুপম তো নিছক চরিত্র।

—বিদ্যুৎ বাঁ-হাতে চা-টা এগিয়ে দিল। কিন্তু তাকানোর ধরনটা আমার ভালো লাগল না। চোখ দুটো যেন রাগে জ্বলছে। কই, এমন তো কিছু বলিনি আমি।

বিদ্যুৎ সংযত গলায় বলে উঠল—আপনি আর যাকে নিয়েই ঠাট্টা তামাশা করুন, অনুপমদাকে নিয়ে করবেন না। উনি-ই আমার আদর্শ। আমার অনুপ্রেরণা—আমার সবকিছু। আসুন, আমার সঙ্গে।

বিদ্যুতের সঙ্গে ওর শোবার ঘরে ঢুকলাম। ঘরের দেওয়ালময় ছবি। না, নামি তারকার নয়, ক্রিকেটারের নয়, আমারও নয়। ছবি সব অনুপম রায়চৌধুরীর। আমার বিভিন্ন কিশোর উপন্যাসে অর্ধেন্দু বটব্যালের আঁকা অনুপমের ছবি। তবে অনেক বড়ো আকারে। বইয়ের ছবিগুলো শিল্পীদের দিয়ে বড়ো করে আঁকানো হয়েছে। আর সেগুলি টাঙানো সারা ঘরে। অনুপমের ধারালো দৃষ্টি, ডান চোখের পাশে আঁচিল, কাঁচা-পাকা চুল, অনুপম যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

অনুপমকে আমি সৃষ্টি করি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। তখন আমি সবে সাংবাদিকতার চাকরি নিয়ে কাগজের অফিসে ঢুকেছি। তার কিছুদিন আগে থেকেই কিশোর পত্রিকায় লেখালেখি করি। একদিন এক ট্যাক্সিওয়ালার সাক্ষাৎকার নিলাম। তার ট্যাক্সিতে ফেলে আসা কোনো এক যাত্রীর একলক্ষ টাকা সে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। দেখা করতে গিয়ে দেখি বস্তির মধ্যে ছোট্ট একটা ঘরে ওরা থাকে। ছোট্ট ছেলেটার পোলিও। আটজনের পরিবারে একমাত্র রোজগেরে ওই ট্যাক্সিওয়ালা। টানাটানির সংসার। অথচ কোনো লোভ নেই। একবারও ওর মনে হয়নি যে, এ টাকাতে বড়ো মেয়েটার স্কুলের খরচ দিতে পারবে। ওর সঙ্গে কথা বলার

সময় 'অনুপম' চরিত্রটার কথা মাথায় এল। মূল্যবোধ, আদর্শ সৎসাহস—সবরকম ভালো ভালো গুণ দিয়ে গড়া আমার এই 'অনুপম'।

দেখতে দেখতে অনুপমকে নিয়ে গল্পগুলোকে ঘিরে জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকল। তারপর ওকে নিয়ে উপন্যাস লিখলাম, 'নগরীর পথে পথে'। কয়েকজন কলেজছাত্রকে নিয়ে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। এরপর তো ইতিহাস। অনুপমকে নিয়ে বহু লিখেছি। লেখাগুলো ছাপা হবার কিছুদিনের মধ্যেই সবগুলোর দ্বিতীয়, তৃতীয় সংস্করণ বেরিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে আবার অনুপমের জনপ্রিয়তাও কমে গেছে। সময় পালটেছে। অনুপম পালটায়নি। বোধ হয় ভালোর সংজ্ঞা, অন্যায়ের সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও অনুপম তো একটা কাল্পনিক চরিত্রই। কোনো রক্তমাংসের মানুষ কখনো অনুপম হতে পারবে না।

ঘরের কোণে রাখা ঠাকুরের মূর্তির ওপর টাঙানো অনুপমের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎ বলে উঠল—উনি-ই আমার দেবতা। আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যে আর কোথাও বেরোবার আগে ওঁকে প্রণাম করি। যেকোনো কাজই করি না কেন, মনে হয় অনুপমদা পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন? আর তাই তো আমি জীবনে কোনো অন্যায় কাজ করিনি। যখনই কোনো খারাপ কাজ করতে গেছি, উনি এসে আমায় বাধা দিয়েছেন, আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ভালো কাজ করতে উৎসাহ জুগিয়েছেন। সবসময় মনে হয় উনি পাশেই আছেন—চোখ বুজে বলে ওঠে বিদ্যুৎ।

—আরে! অনুপম কি আর সত্যিকারের কোনো লোক? ও তো আমার গল্পের এক চরিত্র। আমার কল্পনা। ব্যাস! ভুল করেও অনুপমের মতো হতে যাবে না। তাহলে জীবনে কিছু করতে হবে না। আজকের দিনে ওরকম হলে চলে না।

—থামুন!—বিদ্যুৎ গর্জে উঠল। আমার বয়স যখন আট, তখন আমার বাবা মারা যান। তারও আগে মা। আমি মানুষ হয়েছি দাদুর কাছে। ছোটোবেলাতে আমাদের বাড়িতে রাখা হত 'শিশুজগৎ' পত্রিকা। সেখানে প্রতি সংখ্যায় থাকত অনুপমদার গল্প। সেই সেদিন থেকেই আমাদের বাড়ির একমাত্র গার্জেন অনুপমদা। ওকে অনুসরণ করেই আমি বড়ো

হয়েছি। এমনকী, এই দেখুন আমার ডানহাতটা। বিদ্যুৎ চাদর সরিয়ে দিল, অনুপমদার মতো আমারও ডান হাতটা অকেজো। ডান হাতে কিছুই করি না।

—কিন্তু আমার গল্প অনুযায়ী অনুপমের ডান হাত তো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ছোটোবেলায় পোলিও হয়ে। তোমারও কি তাই?

—না, আমার কোনো রোগ নেই। অনুপমদা ডান হাত ব্যবহার করতেন না বলে আমিও ডানহাত ব্যবহার করি না। বছরের পর বছর এরকম করার ফলে এখন আমি ইচ্ছে করলেও হাতটা নাড়তে পারি না।

বিদ্যুৎ যে স্বাভাবিক নয়, তা আগেই বুঝেছিলাম। এখন বুঝলাম পুরোপুরি ছিটগ্রস্ত। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরোনো যায় ততই ভালো।

—আচ্ছা অসীম তো এখনও এল না, কী ব্যাপার বলো তো?

—কী আবার! নবি ওকে পিছমোড়া করে বেঁধে বাইরের কলঘরে বন্ধ করে রেখেছে।

আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎ হাঁক দিল—নবি, নবি—এবার একে বাঁধো।

পাশের ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে নবি ঢুকল। তারপর আমাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলল। বাধা দেওয়ার কোনো চেষ্টা করলাম না। অসীম খুব ডাকাবুকো লোক। তাকে যদি বেঁধে কলঘরে ফেলে রাখতে পারে, তাহলে আমি তো নস্যি।

এ ঘরটা বাড়ির মূল অংশের থেকে একেবারে আলাদা। বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটুখানি হাঁটাপথ, চারদিক থেকে এমনভাবে গাছে ঘেরা যে দূর থেকে দেখা যায় না। ঘরটা বোধ হয় আগে রান্নাঘর ছিল। এখন সামান্য কিছু আসবাব রাখা এদিকে-ওদিকে। দেওয়ালে কালো পোড়া দাগ। একটা লেখার টেবিল, চেয়ার, একটা ছোটো খাট, একটা বসার চৌকি।

আমার হাত দুটো পিছমোড়া করে নবি খাটের সঙ্গে বাঁধল। কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কাছে এমনিতেও বিশেষ টাকাপয়সা নেই। তবে এভাবে বাঁধা কীসের জন্য?

বিদ্যুৎ কতগুলো সাদা কাগজ আর একটা পেন আমার সামনে খাটের

ওপর রেখে বলে উঠল—অনুপমদাকে আপনাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে, যদি আপনি নিজে বাঁচতে চান।

—মানে?

—মানে আর কিছুই নয়। চোরাকারবারিদের ধরে গ্যাংটক থেকে ফেরার পথে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে অনুপমদা মারা যায়। আট মাস আগে 'হারিয়ে গেল অনুপম' উপন্যাসে সে রকমভাবেই শেষ করেছিলেন, তাই না?

মনে হল বিদ্যুৎ মজা করছে। তাই হালকা সুরে বলে উঠি—তুমি নিশ্চয়ই মজা করছ। অনুপম তো গল্প-উপন্যাসের চরিত্র। তার মরা-বাঁচায় কী আসে যায়?

—আসে-যায়! টেবিলের ওপর ঘুসি মেরে আমার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ বলে উঠল, আমার কাছে অনুপমদা-ই সবকিছু। আমার পৃথিবী। এই দুর্নীতির যুগে আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল অনুপমদা। অনুপমদা-ই পারতেন আমাদের এই ঘুণধরা সমাজে আস্তে আস্তে পরিবর্তন আনতে। সমাজকে পরিষ্কার করতে। আর, আপনি আপনার খেয়ালখুশি মতো অনুপমদাকে মেরে ফেললেন? একবারও আমাদের কথা ভাবলেন না?—বিদ্যুৎ আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখ ছলছল করছে।

—ঠিক আছে, আমি আপনাকে একটা সুযোগ দিতে চাই। এই রইল কাগজ আর পেন। নবি আপনার হাতের বাঁধন খুলে দেবে। আপনি লিখুন। তবে ও এখানেই থাকবে। আপনাকে পাহারা দেবে। খবরদার পালাবার চেষ্টা করবেন না।

—আমি তো বাড়িতে গিয়েও লিখতে পারি। এখন আমায় ছেড়ে দাও।

—না, এখানেই লিখতে হবে। যতদিন না আপনার নতুন উপন্যাসটা বেরোচ্ছে ততদিন থাকতে হবে। আর সে উপন্যাসে ফিরে আসবে আমাদের অনুপমদা।

—কিন্তু সে তো বেশ কয়েক মাসের ব্যাপার।—আর্তনাদ করে উঠি। আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ছি। ছেড়ে দাও! কথা দিচ্ছি, যেমন বলেছ তেমনই লিখব।

—স্যার, স্যার কী হল? কী সব বলছেন?—অসীমের উদ্‌বিগ্ন গলা।

ঘুম ভেঙে যায়। সামনে ড্রাইভারের সিটে অসীম। গাড়ির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে। পুরোটাই স্বপ্ন? স্বপ্ন কি এত সত্যি মনে হয়? কিন্তু বিয়ে বাড়ির কী হল? হাত ঘড়িতে তো রাত সওয়া এগারোটা।

—কী ব্যাপার অসীম? এত দেরি?

—আর বলবেন না। ছ-টার সময় এখানে একটা বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। একটা লোকাল ছেলে মারা গেছে। তারপর থেকে পথ অবরোধ। এই আর মিনিট দশেকের মধ্যে ছাড়বে শুনছি।

—আচ্ছা যে ছেলেটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তার নাম কী?

—দাঁড়ান, জেনে বলছি।—জানলা নামিয়ে অসীম পথচারী একজনকে ডাকতে থাকে।—অ্যাই ভাই, একটু এদিকে এসো। যার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সে ছেলেটার নাম কী?

—বাপি। খুব পরোপকারী, সৎসাহসী ছেলে। অমন ছেলে সত্যিই দেখা যায় না। গরিব ছাত্রদের বিনা পয়সায় পড়াত। কিন্তু সাত-আট মাস আগে কীভাবে যেন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সবসময় বিড়বিড় করত আর সারাদিন বিশুর চা-এর দোকানে ঝিম মেরে বসে থাকত। আজ আনমনে রাস্তা পার হতে গিয়ে—আহা! বেচারির কেউ ছিল না। কপাল, মশাই সব কপাল। এ পৃথিবী ভালোদের জন্য নয়।

—নামটা বাপি বললেন, তাই না—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

—ডাক নাম বাপি, ভালো নাম বিদ্যুৎ। লোকটা একটু থেমে বলে উঠল—ওই যে গাড়ি ছাড়তে শুরু করেছে। আসি।

এর পাঁচ মাস পরের ঘটনা। আমার প্রকাশকের প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও প্রকাশিত হল আমার নতুন উপন্যাস—ফিরে এল অনুপম। গ্রামের কিছু বেকার ছেলেকে সঙ্গো নিয়ে সবার জন্য বিনা খরচে পড়ার সুযোগ করতে নতুন স্কুল গড়ার কাহিনি।

দূরত্ব

—আপনার নাম?

—কেন? অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়েই তো বলেছি। এর মধ্যে নামটা তো আর বদলায়নি।

—আচ্ছা...অবিনাশ। ভালো নাম। এখন তো আর এত বড়ো নাম দেখা যায় না। ঠাকুরদার দেওয়া?

—ঠিক ধরেছেন। তা নামটা কে দিয়েছে তা দিয়ে আপনার কী এসে যায়! আসল কথায় চলে আসুন। যে জন্য আপনাকে দেখানো।

—হ্যাঁ বলুন, কী আপনার অসুবিধে?

—সেটাও তো জানিয়েছিলাম। আবার বলতে হবে?

—আপনি তো দেখছি কথাই বলতে চান না। দেখছি কী কী জানিয়েছিলেন। এই যে—রাতে ঘুম আসে না। অহেতুক নানান ধরনের আবোলতাবোল চিন্তা হয়। বাকি সারাদিনেও ঘুম দু-তিন ঘণ্টার বেশি হয় না। তা আপনার বয়স যেন কত?

—কেন? সে ইনফরমেশনও তো থাকা উচিত।

—দেখি। একশো চল্লিশ। তা এত কমবয়সে তো এরকম হওয়া উচিত নয়।

—তবেই বলুন। দু-শো পেরোলে নাহয় তাও বোঝা যেত। এজন্যই তো আপনাকে দেখানো।

—দাঁড়ান। আপনার হাত দুটো হেল্‌থ মনিটরের রোবটিক আর্মের উপর রাখুন তো। প্রেসারটা দেখি।

—কীরকম দেখলেন?

—নাহ্, প্রেসার তো ঠিকই আছে।

—আর কিছু বলতে হবে?

—না, না—সবই তো এখন রেকর্ডে থাকে। একবার চোখ বুলিয়ে নিই। কিডনি আর হার্ট—দুটোই চেঞ্জ করেছেন।

—হ্যাঁ, কিডনি দু-বার—আর...

—না-না বলতে হবে না। কিডনি 2047 আর 2067-তে; আর হার্ট—দেখতে পাচ্ছি 2075-এ। মেমারি চিপ ইমপ্ল্যান্ট করেছেন। তাও কুড়ি বছর আগে।

—হ্যাঁ একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভাবলাম—চিপ লাগিয়ে মেমারি বাড়িয়ে নিতে পারলে ক্ষতি কী? তা এখন অবশ্য আপগ্রেড করব ভাবছি। অনেক দিন হয়ে গেল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ করে নিন। কুড়ি বছর—ও তো মান্ধাতার আমলের x31 চিপ। এখন কত ভালো ভালো ফাস্ট প্রসেসিং চিপ এসে গেছে। ছোটোবেলার যেকোনো দিনের কথা ভাববেন, দেখবেন পট করে চোখের সামনে চলে আসবে। তা চোখ-কান এসব ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ। কেন সিস্টেমে দেখাচ্ছে না? আবার বলতে হবে?

—আহা চটছেন কেন? আপনি দেখছি কথা বলার ব্যাপারে খুব কৃপণ। আজকাল কথা বলার লোক পাই না তো। বেশির ভাগ পেশেন্টই আপনার মতো। তাই। তা চোখ—চোখ নিয়ে তো একসময় খুব ভুগেছেন দেখছি। ছানি—রেটিনার হাই প্রেসার থেকে প্রবলেম— তারপর অবশ্য 2080-তে কৃত্রিম চোখ করিয়ে নিয়েছেন। তা অ্যাডজাস্টমেন্টের অসুবিধে হয়নি তো?

—না-না বেশ আছি—কোনো ছানির ভয় নেই—কোনোরকম খারাপ হওয়ার চান্স নেই। লেন্স-চশমা পরতে হচ্ছে না। দিব্যি ভিডিয়ো গেম খেলি। শুধু মাঝেমধ্যে আপগ্রেড। এই তো কয়েক মাস আগে চেঞ্জ করলাম। এখনকারটাতে রাতেও দিব্যি দেখা যায়। এত পরিষ্কার আগেও দেখতাম না। রাতের আকাশ যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে।

—বেশি জ্বলজ্বল করলে আবার মুশকিল। তা তার জন্যই রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে না তো?



—তা সে তো আপনি বলবেন। এত টাকা নিচ্ছেন?

—চোখের এই লাস্ট আপগ্রেডের আগে ভালো ঘুম হত?

—নাহ্, অনিদ্রার এই সমস্যাটা বহু দিনের। যত বয়স বাড়ছে—যেন আরও বাড়ছে।

—হুঁ, তাহলে চোখের জন্যও সমস্যাটা নয়, আপনি কি ফ্যামিলি সংক্রান্ত কোনো কারণে টেনশন করছেন? আপনার ছেলে, নাতি—তাদের পুত্রকন্যারা সবাই কি পৃথিবীতেই?



—না, না—তা কখনো হয়? যে যার মতো কাজ করছে। আমার বড়োছেলে—সে তো...

—মঙ্গলে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে পার্মানেন্টলি চলে গেছে দেখছি। ওখানকার সিটিজেনশিপ নিয়েছে।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। এখানে কালেভদ্রে আসে। লাস্ট এসেছিল মা মারা যাবার সময়ে—তা আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। মাঝেমধ্যে কথাবার্তা হয়, ভিডিয়োফোনে দেখাসাক্ষাৎও হয়। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন—কথা

বলার অভ্যাসটাই চলে গেছে। নেহাত ওই আর্থ-ডে-তে পৃথিবীর সঙ্গো সঙ্গো আমার কথাটাও মনে পড়ে। তখন দেখি ফোন করে।

—আপনার ছোটোছেলের সঙ্গোও তো বিশেষ যোগাযোগ নেই। সেও তো প্রায় পঞ্চাশ বছর বাইরে আছে। ওদের জন্য কোনো টেনশন তার মানে হওয়ার কোনো কারণ নেই।

—না, না—ওরা ওদের মতো আছে। আমি আমার মতো। ওদের কারণে টেনশন হওয়ার কোনো জায়গাই নেই।

—সিস্টেমে দেখছি আপনার একটা পুরোনো চাকর আছে। বাপস্‌রে। গত পনেরো বছর ধরে একই চাকর। আজকাল তো ওরা এতদিন টেকে না।

—ঠিকই। তাই তো পুরোনো চাকরটিকে আর ছাড়াইনি। এখন তো অনেক আধুনিক রোবট বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের আবার নানান বায়নাক্কা। রেগুলার ট্রেনিং-এ পাঠাতে হবে। নলেজ আপগ্রেডের সুযোগ দিতে হবে। সপ্তাহে একদিন ছুটি। মাসে দু-দিন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং অর্থাৎ ওদের নিজেদের মধ্যে গল্প-আড্ডার সুযোগ করে দিতে হবে। তা আমার এই চাকরটিকে নিয়ে ওসব কোনো সমস্যাই নেই। আপগ্রেড করার উপযুক্তই নয়। কোনো দাবিদাওয়া নেই। আমার ঘুম-টুম হচ্ছে না বলে মনটা ভারি খিঁচিয়ে থাকে আর তার একটা বড়ো অংশ ওরই ওপর দিয়ে যায়। এটি সেদিক থেকে বেশ। চুপচাপ হাসিমুখে কাজ করে যায়। এখনকারগুলো হলে মুশকিলে পড়তাম।

—হুঁ, ঠিকই বলেছেন। সমস্যায় ফেললেন দেখছি। চাকরের জন্যও কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ওই যে দুশ্চিন্তা হয় বলছিলেন, সেটা তাহলে কী নিয়ে?

—আন্দাজ করুন। আমি কেন—আমার সাতপুরুষের যাবতীয় রেকর্ডও তো দেখছি সার্চ করলেই মুহূর্তে পেয়ে যাচ্ছেন। যা আমি নিজেও জানি না বা ভুলে গেছি তাও দেখি আপনি ইন্টারনেটে পেয়ে যাচ্ছেন—তা আপনিই ভেবে বলুন।

—আপনার ব্লাড টেস্ট—এক মাস আগে করা জেনেটিক টেস্ট—কিডনি, হার্ট, লিভার, ব্রেন—না তাতেও কোনো সমস্যা নেই। সবরকম টেস্টের রিপোর্টই তো নর্মাল দেখছি। বলেই দিন কী নিয়ে দুশ্চিন্তা। একটু সুবিধে হয়।

—দুশ্চিন্তাটা হল সময় কাটানো নিয়ে। রোজ রাতে শুতে যাবার সময় ভাবি পরের দিন চব্বিশ ঘণ্টা কাটবে কীভাবে। কতক্ষণ আর টিভি, কম্পিউটার, রোবট চাকর, ভিডিয়ো গেমস, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি এসব নিয়ে কাটাব? আসলে লোকই তো নেই মনের কথা বলার। সকালে উঠে কোনোরকমে টেনেটুনে দিনটা কাটাই। ধীরেসুস্থে খাই। ঘরের মধ্যে ভার্চুয়াল লেক তৈরি করে লেকের ধার দিয়ে হেঁটে আসি। গাছগুলোতে চোখ বোলাই, পাখপাখালি দেখি। তারপর সন্ধ্যে আসে। চাঁদটা আমার লনে আলো ছড়িয়ে দেয়। বেশ লাগে। তারপর আবার চিন্তা শুরু হয়ে যায়। আরেকটা দিন আসতে চলেছে। একই ভাবে কাটাতে হবে। কোনো পরিবর্তন নেই, কোনো চ্যালেঞ্জ নেই। একটা কথা বলার লোক নেই।

—হুঁ, ঠিকই বলেছেন। আপনাকে কী বলব—আমারও তাই হয়। তবে আমি একটা জিনিস করি। যখন মন খারাপ করে—খুব একা একা লাগে—গান শুরু করি— 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়'—অনেক দিন আগের গান। মানে বুঝেও গাই না। শুধু কথা বলা যাতে ভুলে না যাই—তাই গাই। আপন মনে চিল্লিয়ে গাই।

—ওই তো—'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয় ফিরে আয়'—তাই না।

—বাহ, আপনি তো গানের বেশ সমঝদার। এটা বেশ রেয়ার গান। এক-শো বছর আগের। কারোর জানার কথা নয়।

—রাতের দিকে গান, তাই না?

—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, রাতের দিকেই বেশি গাই।

—একটু নাকিসুরেই গান করেন, তাই তো?

—হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই করি। নাকিসুরে গান গাইলে মনের দুঃখ সব বেরিয়ে গিয়ে মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে যায়।

—একটু আস্তে গাইবেন।

—মানে?

—আপনার গানের গলাটা বিশেষ ভালো নয়। রাতে আমার ঘুম না হওয়ার ওটাও একটা কারণ।

—মানে! বুঝলাম না। আপনি থাকেন কোথায়?

—সিস্টেমে দেখে নিন। এত কিছু দেখেছেন আর অ্যাড্রেস দেখেননি। আমিও জানতাম না। তবে সার্চ করলেই দেখবেন যে, আপনি আমারই প্রতিবেশী। তাই গলাটা শুরু থেকে এত চেনা চেনা লাগছে। তারপর যখন ওই গান বললেন—অমন নাকিসুরে বেসুরো চিৎকার একবার শুনলে কেউ ভুলবে না।

—আপনি তার মানে ওল্ড এজ রিসোর্ট ব্যারাকপুরে থাকেন, তাই তো? কত নম্বর?

—12। আপনারটা?

— 8। একটা কথা বলব? আপনি তো ঘর থেকে প্রায় বেরোনই না।

—তা সেটা কি আপনার ক্ষেত্রেও ঠিক নয়?

—হ্যাঁ, তা বটে। একটা কাজ করা যাক। দরজাটা খুলুন। করিডোর পেরিয়ে আমার ঘরের দরজায় বেল দিন। একটু চা খাওয়া যাক একসঙ্গো। আশি বছর পাশাপাশি আছি, অথচ একে অপরকে চিনি না, এটা কি ঠিক?

—তাই ভাবুন। কী আশ্চর্য। আমি এখুনি আসছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ এক্ষুনি চলে আসুন। আপনার অভদ্র রোবট চাকরটাকে খবরদার সঙ্গো আনবেন না। একদিন আমার প্যাসেজের সামনে ময়লা ফেলতে বারণ করেছিলাম। তা এখন দেখি ইচ্ছে করে ঠিক প্যাসেজের সামনেই ফেলে।

—ঠিক আছে আসছি। গণেশ—

অবিনাশবাবু সামনের ভিডিয়ো ফোনটা আর ভার্চুয়াল মেডিক্যাল সেন্টার দুটোই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন।

অচেনা

আমাদের এই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সটা বেশ ভালো। বেশিরভাগ ছাপোষা চাকরিজীবী বাঙালি। অবসর সময় বেশিরভাগের কাটে আড্ডায়। তাতে কখনো ক্রিকেট, কখনো রাজনীতি তো কখনো বাজারের পটল-বেগুন-পাবদা মাছের দাম। কমপ্লেক্সের মধ্যে একটা বট গাছ আছে। তাকে ঘিরে একটা গোল চাতাল। তাতেই আমরা সন্ধ্যের সময়ে মাঝেমধ্যে জমায়েত হই, তা ইদানীং আমাদের আলোচনায় একজনের নাম ঘুরে ফিরে আসে। সুদীপ চ্যাটার্জি।

মাসখানেক হল আমাদের এখানে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে এসেছেন। একা থাকেন, কী করেন কিছুই বোঝার উপায় নেই। কোনো কাজের লোক নেই, বাড়িতে কোনো আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরও যাতায়াত নেই। মাঝেমধ্যে সপ্তাহ খানেকের জন্য কোথাও উধাও হয়ে যান আবার কখনো কখনো হাতে একটা ফাইল নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়।

অনিন্দ্যই আজ প্রথম বলে উঠল—ভদ্রলোক বোধ হয় আইটি-তে আছেন, এত চুপচাপ, কম কথা বলেন। ভুঁড়ি আছে, চশমাও আছে, আইটি না হয়ে যায় না।

—যাহ, আইটি হলে একটা ল্যাপটপ থাকত না সঙ্গে? আর আইটির লোকেরা ওরকম চাপদাড়িও রাখে না। ভদ্রলোক নির্ঘাত সায়েন্টিস্ট হবেন। কীরকম আনমনা চাউনি। সেদিন দেখলাম ভট্চাজদের কুকুরটার দিকে

মিনিট তিনেক একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে নিজের মনে কী একটা খুব শক্ত কথা বলে চলে গেলেন। —কৌশিক বলে।

ব্যাস—যথারীতি কৌশিক আর অনিন্দ্যর মধ্যে একটা তর্কাতর্কি বেধে গেল।

আসলে, বাঙালিদের এই কৌতূহল চিরকালের। যারা মিশুকে নয়, কথা বিশেষ বলে না—তাদের নিয়ে কৌতূহল আরও বেশি হয়। সুদীপবাবু ভালো-খারাপ যেমনই হোন—একটু যে অন্যরকম তা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। যাই জিজ্ঞেস করা হয়, শুধু মিটিমিটি হাসেন। কুল গাছ দেখে হাঁ করে চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন। সেদিন মুখার্জির লাল স্যান্ট্রো গাড়িটার সামনে হঠাৎ এসে পড়েছিলেন। ধাক্কা লাগতেই পারত। কিন্তু সুদীপবাবু এতটুকু রাগেননি, উলটে অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নেড়ে নাকি বলেছিলেন—নাহ্, হিসেব মিলল না। চার ন্যানো সেকেন্ডের জন্য মিস করে গেলাম।

আমার সামনেই সেদিন দেখলাম মাছওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, তপসেটা পচা হওয়ার প্রোব্যাবিলিটি কত? মাছওয়ালা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

সেদিন থলে নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন। জেনেও শুধু আলাপ করার জন্যই প্রশ্ন করি—বাজারে যাচ্ছেন?

আবার সেই এক হাসি। কোনো কথা নেই। আলাপ করার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়।

বাজারে ফের দেখা। তখন ভারী ব্যাগ। লাউ, সজনে ডাঁটা উঁকি মারছে। আবার আলাপ জামাই—বাজার হল?

উত্তরে সেই হাসি।

—কীরকম লাগছে এ জায়গাটা?

আবার হাসি, মুখে কোনো কথা নেই।

এরকম বেশ কয়েক সপ্তাহ আমাদের মধ্যে ওনার সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হওয়ার পরে কৌশিকের পক্ষেই সিদ্ধান্ত গেল। সুদীপবাবু সায়েন্টিস্ট শুধু নন—বড়ো সায়েন্টিস্ট। নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ গোপন রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

কয়েক দিন আগে ওনার ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেছে, কেউ বলে লাল, কেউ বলে নীল। মানস মাঝ রাতে ওনার ঘর থেকে অদ্ভুত একটা জন্তুর আওয়াজ শুনেছে। বলেছে নাকি কুকুরের আর বেড়ালের ম্যাও-ম্যাও-এর মাঝামাঝি একটা আওয়াজ।

মানস নানা ধরনের আওয়াজ করে করে শোনাল। কিন্তু নিজেই স্বীকার করে নিল যে আসল আওয়াজটার কাছাকাছি হয়নি কোনোটাই।

সেদিন ভটচাজ্জিদা হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। কোনোরকমে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠলেন—এই দেখো, সুদীপের ফ্ল্যাটের নীচ দিয়ে যাচ্ছিলাম—হঠাৎ এই কাগজটা সামনে এসে পড়ল। বলে একটা দাগকাটা দোমড়ানো কাগজ আমাদের সামনে খুলে ধরলেন।

আমরা সবাই মিলে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। তাতে শুধু নানান ধরনের সিম্বল, আর মাঝেমধ্যে দু-একটা সংখ্যা। আমাদের মধ্যে শমিত অঙ্কের টিচার। বেশ খানিকক্ষণ দেখে ও মাথা চুলকে বলে উঠল—হুঃ, মনে হচ্ছে খুব উঁচু দরের কোনো ইকুয়েশন। অর্ধেকটা বোঝা যাচ্ছে। ঠিকই ধরেছেন। সায়েন্টিস্টই হবেন।

স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলনের ছোটো একটা অনুষ্ঠান ছিল। সাহাদাই বরাবর বক্তৃতা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। ওনার বেশ বয়েস হয়েছে। একসময় একটা নামকরা ক্লাবে ফুটবল খেলতেন। ব্যাঙ্কের চিফ ম্যানেজার ছিলেন। এবার ওনাকে বলতেই উনি হাঁইহাঁই করে উঠলেন। বললেন—এত বড়ো একজন সায়েন্টিস্ট এখানে থাকতে আমি করব ফ্ল্যাগ হয়েস্টিং! ছিঃ ছিঃ। ওনাকে বলো।

ঠিক কথা। এ উপলক্ষ্যে ওনার ফ্ল্যাটেও যাওয়া যাবে। তা যেই ভাবা সেই কাজ। আমরা কয়েকজন মিলে সন্ধ্যে বেলা ওনার ফ্ল্যাটে হানা দিলাম। কলিংবেল বাজানোর মিনিট তিনেক বাদে দরজা খুললেন। হাতে একটা বড়ো ইনজেকশান দেওয়ার সিরিঞ্জ। তাতে নীলচে রঙের লিকুইড। ভেবেছিলাম চিনতে পারবেন। কিন্তু পারলেন না। আনমনা দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—না না, আইআইটি-র কনভোকেশনে আমি যেতে পারব না। আপনারা বরং রাজ্যপালকেই ধরুন। কোনোরকমে থামিয়ে আমরা আমাদের পরিচয় দিয়ে আসার কারণ জানালাম।



সংবিত ফিরে সব শোনার পর মিষ্টি হেসে বলে উঠলেন—ইস, খানিক আগে বললে যেতে পারতাম। একটু আগেই স্টাইগন্যারকে কথা দিলাম। একটা কনফারেন্সে যেতে হবে।

পাশ থেকে রজত বলল—তা, কনফারেন্সের পরই এসে যদি উদ্‌বোধনটা করে দেন।

উনি মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন—সে কি হয়! ওটা তো জার্মানির বার্লিনে।

কুশল উৎসাহী হয়ে পিছন থেকে বলল—তাহলে আপনি ফিরে এলেই না হয় ফ্ল্যাগ হয়েস্টিংটা হবে।



আমরা কুশলকে বোঝালাম যে সেটা সম্ভব নয়। ওটা ১৫ আগস্টেই করতে হবে। সুতরাং ওনার ওপর নির্ভর করা সম্ভব নয়।

চলে আসার সময় অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমিই সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, আপনার রিসার্চের টপিকটা কী?

সুদীপবাবু ফের মিটিমিটি হাসলেন। আঙুলটা আকাশের দিকে তুলে ধরে বললেন—প্রকৃতির জটিল সমীকরণগুলো সলভ করা। তারপর আবার বললেন—আমি অত্যন্ত সাধারণ এক মানুষ। একি আর আমার দ্বারা হবে। তবু চেষ্টা—গত কুড়ি বছর ধরে। বলে একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বলতেই হবে সেই আনমনা চোখে আমরা হারিয়ে গেলাম। তারাভরা আকাশটা যেন স্পষ্ট ওনার চোখের ভেতরে চকচক করে উঠল। ওনার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাটাও দশ গুণ বেড়ে গেল।

কয়েকদিন বাদে আমরা সবাই মিলে আড্ডা মারছি। হঠাৎ দেখি সুদীপবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। একটু যেন চিন্তার ছাপ মুখে।

গলা খাঁকরে নীচু স্বরে বলে উঠলেন—কথাটা যেন জানাজানি না হয়। এই ধরনের কাগজ কেউ কি পেয়েছেন? রোজ সকাল বেলা দেখি কে যেন আমার দরজার তলা দিয়ে একটা করে কাগজ রেখে যায়। বলে গোটা দশেক সবুজ রঙের পাতা আমাদের হাতে তুলে দিলেন ভদ্রলোক।

কাগজের একটা দিকে 'মেডিকা' বলে একটা মেডিক্যাল ইনসিয়োরেন্স কোম্পানির নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার লেখা। অন্যদিকে ইতস্তত ছড়ানো ছেটানো কয়েকটা সংখ্যা। প্রত্যেকটা কাগজে আলাদা আলাদা সংখ্যা। ভালো করে লক্ষ করতে দেখা গেল '১৩' সংখ্যাটা প্রত্যেকটা কাগজেই আছে।

কাগজগুলো হাতে নিয়ে আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। কেউই এরকম কাগজ পাইনি। বেশ খানিকক্ষণ কারও মুখে কোনো কথা নেই। তারপর আমিই জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কাগজের উলটোদিকের ওই কোম্পানিটার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিলেন কি?

উনি মাথা নাড়লেন—নাহ্, আমার কি আর অত সময় আছে? ওটা তো একটা নামকরা হেলথ ইনসিয়োরেন্স কোম্পানি। আসল রহস্যটা তো আছে উলটোদিকের পাতায়।

—কী মনে হয়, কিছু বুঝলেন?

—হ্যাঁ, ডিকোড করে দেখলাম—আর কিছু নয়। আমার প্রাণনাশের হুমকি। হয় আমার রিসার্চ বন্ধ করতে হবে নয়তো—

আমরা সবাই একসঙ্গো চেঁচিয়ে উঠলাম—সেকী! তা আপনি পুলিশে জানিয়েছেন?

—নাহ্, এসব সামান্য কারণে কি আর এ সমস্ত কথা পুলিশকে বলা যায়? প্রাণ আগে না দেশ আগে! যাক সে কথা। বলতে বলতে আবার ফিরে চললেন।

আমরা সবাই ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। সন্দীপের মতো শান্ত লোক—সে-ও হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে বলে উঠল—যে করেই হোক দাদাকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। দেশের জন্য উনি প্রাণ দেবেন আর আমরা একই কমপ্লেক্সে থেকেও চুপ করে তা মেনে নেব?

বলতে নেই, সেদিন থেকে আমরা ছোটো-বড়ো সবাই সুদীপদাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করলাম। ফ্ল্যাটের নীচেও কেউ ঘোরাঘুরি করলে তাকে কড়াকড়া প্রশ্ন করতে ছাড়তাম না। যতই হোক, একজন নামকরা সায়েন্টিস্টের নিরাপত্তা। উনি যা করেন আমরা সবাই তাই করতে চেষ্টা করি। উনি একদিন হলুদ পাঞ্জাবি পরলেন তো পরেরদিন দেখা গেল আমাদের বেশ কয়েক জনের গায়ে হলুদ পাঞ্জাবি।

তা, সবাই তো আর একরকম নয়, কারও কারও মধ্যে হিংসেটা একটু বেশি থাকে, নির্বেদ সরকার এরকমই একজন। একসময়ে আইএসআই-তে নামকরা অঙ্কের প্রফেসার ছিলেন। ভারি দেমাক। কেউ বাড়িতে যেতে চাইলেই বলতেন, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসো।' কবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যাবে তা জিজ্ঞেস করলে দু-সপ্তাহ পরের একটা দিন বলে দিতেন।

তা এরকম লোককে যে কেউ সহ্য করতে পারবে না, তাতে আর আশ্চর্য কি? আবার সুদীপদার মতো লোক আসার পরে কেউ আর ওনাকে বিশেষ পাত্তাও দেয় না। ভারি খেপে গিয়ে দুর্গাপুজোর নবমীর দিনে উনি একদিন আমাদের সামনেই সুদীপদাকে চেপে ধরলেন।

—আপনি কী নিয়ে রিসার্চ করেন, বলুন তো? কোথায় চাকরি করেন? কোনো উত্তর না দিয়ে সুদীপদা শুধু মিটিমিটি হাসলেন। তাতে দারুণ খেপে গিয়ে নির্বেদবাবু বলে উঠলেন—শুধু বুজরুকি তাই না। উলটোপালটা সিম্বল আঁকা কাগজ লোকের মাথায় ছুড়ে জ্ঞান জাহির করা হচ্ছে? অনেক হাত পালটে কাগজটা আমার কাছেও এসেছে। ওর না আছে কোনো মাথা—না মুণ্ডু।

আমরা নির্বেদবাবুকে প্রায় মারতেই যাচ্ছিলাম। সুদীপদা মুচকি হেসে হাত তুলে আমাদের থামতে বললেন। তারপর হাসিমুখেই বললেন— $-x^2/x$ হলে কী ধরে নিতে হয়?

—কী আবার? x যে জিরো নয় তাই ধরে নিতে হয়।

সুদীপদা ফের হাসি হাসি মুখে বললেন—আর যদি 'x' জিরো হয়?

নির্বেদবাবুর অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে বলে চললেন—আমরা যা ধরে নিই, তা ওরা ধরে না। ইনকারাও ধরত না। তাই আমাদের কাছে যা সেমিকোলন, ওদের কাছে তা অন্যরকম। এই বলে আঙুলটাকে ওপরের দিকে তুলে বলে উঠলেন—অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সিও একই নিয়মে চলে।

গত তিন বছরে নির্বেদবাবুকে আমরা কখনো এতটা চুপসে যেতে দেখিনি। ওনার মতো দুর্মুখ লোককে প্রায় চুপ করিয়ে দিয়ে যেতে যেতে সুদীপদা অস্ফুটে বলে উঠলেন—নাহ্, অঙ্কটা মিলছে না।

কয়েক দিন পরের ঘটনা। শুনলাম নির্বেদবাবু কোমরের চোটের জন্য হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। কমপ্লেক্সের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে দেখা করতে গেলাম। দেখি হাসপাতালের বেডে শুয়ে ভদ্রলোক ছটফট করছেন। ওরকম তাগড়াই চেহারা। দেখে খারাপই লাগল। নির্বেদবাবু আমাদের দেখে কোনোরকমে বলে উঠলেন—ওই লোকটি একদম সুবিধের নয়, চ্যালেঞ্জ করেছি বলে কীরকম প্রতিশোধ নিল দেখলেন?

—কে? কোন লোকটার কথা বলছেন?

—আরে, ওই তোমাদের বিজ্ঞানী সুদীপবাবুর কথা বলছি আর কি। ওর জন্যই তো আমার এই অবস্থা।

—সেকী! আপনাকে মেরেছেন নাকি?

—না, তা নয়। দু-দিন আগে দেখি মুন্না সিং বলে একটা লোক এসেছে আমার ফ্ল্যাটে—বডি ম্যাসাজ করতে, বলে কিনা বিনা পয়সায় ট্রায়াল ম্যাসাজ, ভালো লাগলে মাঝেমধ্যে আসবে। রাজি হয়ে গেলাম। বিনা পয়সার ব্যাপার যখন। তা জীবনে ওসব করিনি। কী কুক্ষণে যে করাতে গেলাম। নির্বেদবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—তো? তারপর? লোকটা গুন্ডা ছিল নাকি?

—হ্যাঁ, তা বলতে পার। খানিকবাদে আমাকে উপুড় করে ফেলে পিঠের ওপর সে কী লাফালাফি! কখনো ঘাড় ধরে টানে তো কখনো পায়ের আঙুল প্রায় ভেঙে দেয়। কখনো কোমর ধরে এমন টান মারে যে

মনে হয় যেন রামধনুকে টান দিচ্ছে। আবার চুল নিয়ে কখনো চুলোচুলি করে তো কখনো মাথার তালুতে দমাদ্দম ঘুসি—ওহ্।

—তা আপনি কিছু বললেন না। অন্তত আমাদের তো ডাকতে পারতেন। অভিমানী সুরে কৌশিক বলে।

—আরে এরকম অবস্থা যে হবে তা কি তখন বুঝেছি? প্রথমবার। ভেবেছি ম্যাসাজ বুঝি এরকমই হয়, তাই চুপচাপ মার খেলাম দেড় ঘণ্টা। তা শেষ হওয়ার পর সেই হতভাগা বলে কি জানো?

—কী? আমরা সমবেতভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম।

—বলে যে আমার এরকম লোহার শরীর বলেই নাকি এ ম্যাসাজ সহ্য করতে পারলাম। এ নাকি কোনো সাধারণ মানুষ সহ্য করতে পারে না। আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আমাকে অসাধারণ মনে হল কীভাবে? তার উত্তরে লোকটা বলল যে, সুদীপ নাকি ওকে বলেছে আমি কুংফুতে ভারত-চ্যাম্পিয়ন। আমাকে ভুলেও যেন আস্তে আস্তে ম্যাসাজ না করে। তাতে নাকি আমাকে অপমান করা হবে। বোঝো।

আরও খানিকক্ষণ কথা বলে সেদিন হাসপাতাল থেকে চলে এসেছিলাম। খারাপ লেগেছিল, তবে বিশ্বাস করিনি। কিছুদিন বাদে সুদীপদার দেখা পেয়ে নির্বেদবাবুর ব্যাপারটা জানিয়েছিলাম। তা উনি দেখি মুখে চুকচুক করে আওয়াজ করে মাথা নেড়ে বললেন—কী যে ভুলো মন আমার। ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

বলে একটু থেমে আবার বললেন—তা ভদ্রলোকের মেডিক্যাল ইনসিয়োরেন্স আছে কি? চিকিৎসার খরচ আজকাল এত বেড়ে গেছে। এইজন্যই সবার মেডিক্যাল ইনসিয়োরেন্স রাখা উচিত বুঝলেন? এই তো ক-দিন আগে আমার এক আত্মীয়—হঠাৎ তার লিভারের সমস্যা। এখন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ। অথচ কোনো ইনসিয়োরেন্স নেই।

এটাই সুদীপদার সঙ্গে শেষ দেখা। কয়েকদিন বাদে শুনলাম সুদীপদা নাকি কমপ্লেক্স ছেড়ে চলে গেছেন। শুনে তো সবার মন খুব খারাপ। কমপ্লেক্সের গ্ল্যামার এক ধাক্কায় অর্ধেক। যার ফ্ল্যাটে ভাড়া ছিলেন তাকে ধরলাম। যদি সুদীপদার কোনো ঠিকানা পাওয়া যায়। নাহ্, পাওয়া গেল না। ছোটো নোটে যাওয়ার আগে শুধু লিখে গেছেন যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর

জন্য সুমেরুর বিলুপ্তপ্রায় সাদা ভালুকদের পাশে দাঁড়াতে কিছুদিনের জন্য ওনাকে নাকি ওদিকে যেতে হচ্ছে।

সুদীপদার আর খোঁজ পাইনি। সায়েন্টিস্টরা বুঝি এরকমই হন। নিজেদের প্রচারের আলো থেকে দূরে রেখে শুধু কাজই করে যান। আর আমাদের মতো নিন্দুকেরা! আমরা শুধু সন্দেহ করি, পরনিন্দা, পরচর্চা করি। ঠিক যেমন নির্বেদবাবু। দু-মাস বাদে আধখানা চেহারা নিয়ে কমপ্লেক্সে ফিরে এসে বললেন—বিজ্ঞানী না হাতি! মেডিক্যাল ইনসিয়োরেন্সের এজেন্ট। কীরকম কায়দা করে সবার হাতে 'মেডিকা' ইনসিয়োরেন্সের সব ডিটেলস রেখে গিয়েছিল। ওই সবুজ কাগজটা মনে পড়ে? আমরা সবাই অন্যদিকের হাবিজাবি অঙ্কই দেখছিলাম। কিন্তু তখন খেয়ালই হয়নি যে ব্যাটা একটা ইনসিয়োরেন্স এজেন্ট। কায়দা করে অ্যাডভার্টাইজ করছে। দেখো কী সুন্দর প্লট। শুরু থেকেই যেটা চালিয়ে গেছে যাতে ওর প্রতি আমাদের কৌতূহল তৈরি হয়। তোমরা বেশিরভাগই ওকে ফলো করতেও শুরু করেছিলে। অবশ্য আমি না। তারপর নিজের সেই ভালো ইমেজটা কাজে লাগিয়ে ও সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছে ইনসিয়োরেন্সের ডিটেল্‌স।

আমরা সবাই নির্বাক হয়ে শুনছিলাম। নির্বেদবাবু বলে চললেন—প্রথমে বুঝতে পারিনি, হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে 'মেডিকা' ইনসিয়োরেন্সের কাগজটার লোকাল নাম্বারে ফোন করে কথা বলার পর হঠাৎ মনে হল গলাটা আর কথা বলার ধরনটা এত চেনা চেনা লাগছে কেন। পরে খেয়াল হল। লোকটার সঙ্গে দেখা হোক, দেখাচ্ছি মজা।

আমরা কিছু বললাম না। নিন্দুকেরা তো কত কিছুই বলে। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে আমরা প্রত্যেকেই সুদীপদার শেষ উপদেশটাও শুনেছি। চোখের সামনে নির্বেদবাবুর অবস্থা দেখে দল বেঁধে 'মেডিকা' ইনসিয়োরেন্সটা করিয়েছি। এই কয়েকদিন হল।

জল চুরি

অভি অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছিল। নকল নায়াগ্রা ফলস দেখে দেখে আর কতক্ষণ সময় কাটানো যায়। দেড় ঘণ্টা আগে রোমের কলোসিয়ামে গ্ল্যাডিয়েটারদের লড়াই দেখে এসেছে। তাও অবশ্য নকল। বিশাল কলোসিয়ামের মধ্যে মানুষে মানুষে, মানুষে-পশুতে লড়াই। মাঝেমধ্যে মনে হয় সত্যিই বুঝি চোখের সামনে হচ্ছে। কিন্তু হাতটা সুইচ ছোঁয়া মাত্রই আসল সত্যটা ধরা পড়ে যায়। সুইচ টিপলেই কলোসিয়াম ভ্যানিশ, গ্ল্যাডিয়েটার ভ্যানিশ। সামনে শুধু নীলরঙা দেওয়াল, টিমটিমে নীল আলো আর কয়েকটা ফার্নিচার।

দামি যন্ত্র। ছ-মাস আগে কিনেছে। প্রথমদিকে বেশ মজা লাগত। একটা সুইচ টিপলেই সঙ্গোসঙ্গো ঘরের মধ্যে ইচ্ছেমতো সেইরকম পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। এখন ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে গেছে। ভার্চুয়াল রিয়ালিটির দৌড় আর কদ্দুর হবে! খোলা বাতাসের স্পর্শ, চাঁদের আলোর ছোঁয়া, ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ, এসব কি আর তাতে থাকে? বাস্তবতার চমকও নেই। তবু এই নিঃসঙ্গা জীবনে যন্ত্রটা মাঝেমধ্যে বেশ কাজেই লাগে। সুইচটা অফ করে অভি অন্ধকার বারান্দায় সোফায় এসে বসল। আকাশে আজ মেঘ নেই। তাই কিছু তারা দেখা যাচ্ছে। মানুষ যখন খুব একা হয়, তখন এরাই কথা বলে। এরাই সঙ্গা দেয়।

অভি একটা মার্কেটিং এজেন্সিতে কাজ করে। বাড়িতে বসেই কাজ। দরকার মতো ভিডিয়ো কনফারেন্সিং করে নেয়, ফোনে মিটিং সেরে নেয়।

কিন্তু শেষ কবে যে অফিসের কাউকে সামনাসামনি দেখেছে তা মনে করতে পারল না অভি। বছর চারেক আগে অফিসের একটা পার্টিতে কয়েক জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু সেরকম আবার কবে হবে কে জানে! এটা যে শুধু অভির কোম্পানিতে হয় তা নয়। সব কোম্পানিতেই এখন লোকেরা বাড়ি থেকেই কাজ করে। তাতে অফিসের কোনো জায়গাও লাগে না, কোম্পানির অনেক খরচও বেঁচে যায়। যাতায়াতের ঝামেলাটা তো বাঁচেই। প্রথম দিকে এটা অভির ভালোই লাগত। এখন মনে হয় অত্যাচার। সারাক্ষণ বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকা! না আছে বন্ধু, না আত্মীয়।

আর বাজার? আগে অভির বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা শাক-সবজি-মাছের বাজার ছিল। বাজারের থেকেও কথাবার্তা বলার জন্যই অনেক লোক জমায়েত হত! তাও চলল না। ইন্টারনেটেই সবকিছু কম দামে পাওয়া যায়। কয়েকটা ক্লিকেই মাছ অর্ডার হয়ে যায়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই রোবটকর্মীরা বাড়িতে এসে তা দিয়েও যায়। তাই সে বাজারও কয়েক বছর আগে উঠে গেছে। বেপরোয়া হয়ে অর্ডার ডেলিভারি করতে আসা এক রোবটকর্মীর সঙ্গে কয়েক দিন আগে গল্প করার চেষ্টা করেছিল অভি। উত্তরে বার তিনেক শুধু 'থ্যাঙ্ক ইউ' শুনেছে। একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস পড়ল অভির । নাহ্, আর কিছুদিন এরকম কথা না বলে থাকলে ও বোধ হয় পাগলই হয়ে যাবে। সামনাসামনি দেখা, কথা বলা, হাতের স্পর্শ—সেসব কি আর কম্পিউটারের মারফত হয়?

আবার ঘড়ি দেখল। রাত দেড়টা। পাড়া নিস্তব্ধ। আগে মাঝরাতে রাস্তায় কুকুর ডাকলে অভি বিরক্ত হত। এখন মনে হয় কী সুন্দর! ওটাও তো শব্দ। সত্যিকারের শব্দ। এখন ডাকও নেই। চারদিকের নিস্তব্ধতা আজ অভিকে এমনভাবে ঘিরে ধরেছে যে, মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে আসবে। মনে হচ্ছে ওকে পৃথিবীতে একা ফেলে সবাই মঙ্গালে পাড়ি দিয়েছে।

ঠিক এইসময় খুট করে একটা শব্দ হল। অবাক হয়ে বাইরের দরজার দিকে তাকাল অভি। আস্তে আস্তে কেউ দরজাটা খুলছে। নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল অভি। ছায়ার মতো একজন কেউ ভেতরে ঢুকল। দরজা ফের বন্ধ হয়ে গেল, অন্ধকারের ঘনত্বটাকে আরও খানিকটা

বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা সটান শুয়ে পড়ল। তারপর বুকে ভর করে ঘরের মধ্যে ঘষটে ঘষটে এগোতে লাগল। কে হতে পারে? চোর? কথাটা ভেবেই সারা গায়ে শিহরন হল অভির। চোর ডাকাত এখন ইতিহাস। ওদের সম্বন্ধে জানতে হলে ইন্টারনেট সার্চ করে পড়াশোনা করতে হয়। সেরকমভাবেই চোরেদের কথা জেনেছে অভি। এরা অন্যের ঘরে এসে চুরি করত। দামি জিনিস ঘরে থাকলে সে বাড়িতে চোরের হানা বেশি হত। এরা সারা শরীরে তেল মেখে আসত যাতে ধরতে গেলে পিছলে বেরিয়ে যেতে পারে। তা এও কি তেল মেখে এসেছে! লোকটার বুক ঘষে এগোনোর ধরন দেখে ঠিক ঠাহর হল না অভির। নিশ্বাস প্রায় বন্ধ রেখে মাথা যতটা সম্ভব না ঘুরিয়ে লোকটা কোথায় যায় তা লক্ষ করতে থাকল অভি।

একদিকে খানিকটা ভয়, অন্যদিকে আনন্দ। ভয় এখানেই যে হঠাৎ করে অভির উপস্থিতি টের পেয়ে মারধোর করবে না তো। তবে আনন্দটা পাল্লায় অনেক ভারী। এ ধরনের অভিজ্ঞতা কোটিতে একজনের হয়। এ ঘটনা শোনার জন্যই নির্ঘাত অনেক বন্ধু জুটে যাবে অভির। সোফার আড়ালে যতটা সম্ভব শরীরটাকে লুকিয়ে চোরের ওই কুমিরের মতো বুক ঘষে এগিয়ে যাওয়া দেখতে লাগল অভি।

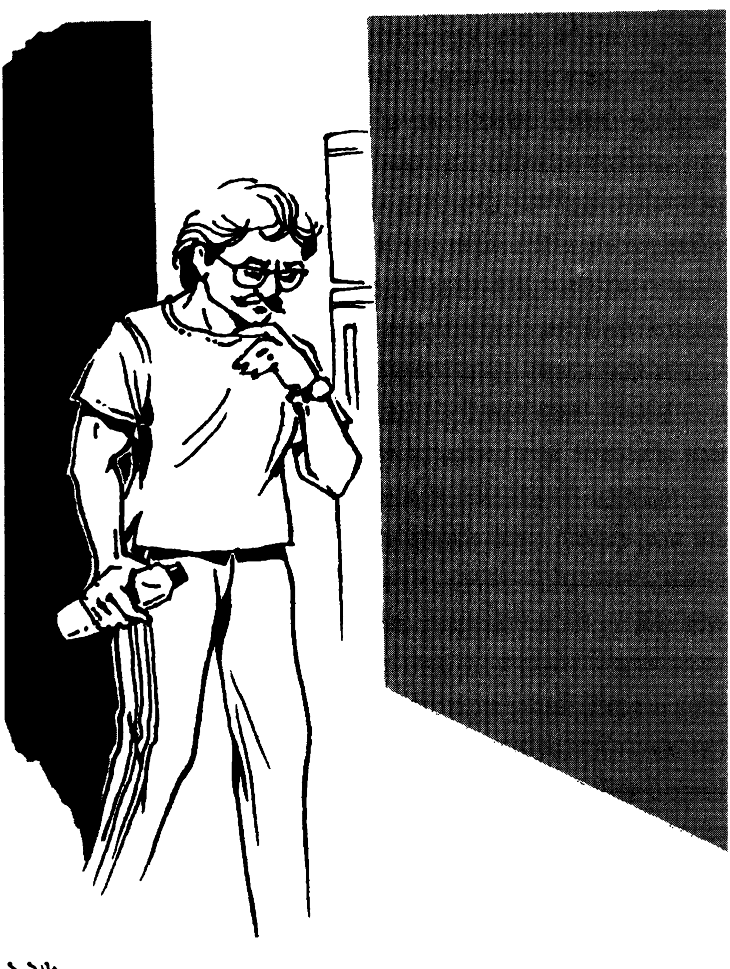
লোকটা রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছে। দরজার কাছে এসে উবু হয়ে বসে রান্নাঘরের দরজা সাবধানে খুলল।

রান্নাঘরে কী দামি জিনিস থাকতে পারে? অবাক হয়ে ভাবছে অভি। এর মধ্যে লোকটা সোজা দাঁড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। দু-মিনিট বাদে বুক চিতিয়ে সোজা হেঁটে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। আগের ভয় ভয় ভাবটা আর নেই। দু-হাতে দুটো বড়ো বোতল। সর্বনাশ! জল চুরি! একথাটা তো মাথায় আসেনি। নিয়মমতো এখন এক-একজন দিনে দু-বোতল খাবার জল পায়। এরকমই নিয়ম। প্রত্যেকের জন্য তাই নির্দিষ্ট। সেটা চুরি করা মানে তো জল না খেয়েই কাল অভিকে সারাদিন কাটাতে হবে। যত টাকাই দাও না কেন জল কেনার আর উপায় নেই। এটাই সরকারি ব্যবস্থা।

আসলে খাবার জলের যা অবস্থা! নিয়ম না করলে অনেক লোক জলের অভাবে মারাই যাবে। অন্য কয়েকটা দেশে মারাও গেছে। কোটি কোটি লোক।

নাহ্, চোরের মুখোমুখি না হয়ে আর উপায় নেই। জল পেয়ে লোকটা মহাফূর্তিতে বাইরের দরজার দিকে এগোচ্ছে।

যা থাকে কপালে! পুট করে ঘরের আলোর সুইচটা অন করল অভি। মুহূর্তের চোখ-ধাঁধানো ভাবটা কাটার সঙ্গোসঙ্গো অভি লক্ষ করল চোর আর কেউ নয়—পাশের বাড়ির আশিসদা। উনি এতই চমকে গেছেন যে হাত থেকে একটা বোতল মাটিতে সশব্দে পড়ে গেল।



অভি ছুটে গিয়ে মাটি থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে বলে উঠল—ছিঃ ছিঃ আপনি আমার জল চুরি করছিলেন? লজ্জা হয় না!

আশিসদার মুখটা সাদা ফ্যাকাশে। লজ্জায় কান দুটো লাল হয়ে উঠেছে। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন।

—আপনি এত বড়ো একটা চাকরি করেন, আর পড়শির ঘরে ঢুকে চুরি করছেন?



—মা-মা-মানে-ওই-জল-জল—আশিসদা প্রচণ্ড মাত্রায় তোতলাতে শুরু করেছেন। একটু থেমে ফের বলে উঠলেন—বড়ো নাতিটাকে প্রথম দেখলাম। ওরা আমার বাড়ি এসেছে। অথচ ঘরে জল নেই। তা-তাই...

—তাই আপনি আমার ঘরে ঢুকে চুরি করছেন? ছিঃ ছিঃ, আমার কী হত বলুন তো, কালকে সারাদিন জল না পেয়ে?

—আসলে নাতিটা জল চাইল। মাথাটা ঠিক ছিল না, ভাবলাম—

—কিন্তু আমার বাইরের দরজাটা খুললেন কী করে? কোডটা পেলেন কোথায়?

—সেটা আর শক্ত কাজ কী। সবই তো সার্চ করলেই পাওয়া যায়। যখন ইচ্ছে ব্রেনকে ইন্টারনেটে কানেক্ট করবেন—মাছ কিনবেন, সবজি কিনবেন, অর্ডার দেবেন! সব চিন্তা করে—আর ব্রেন হ্যাক হবে না? ওভাবেই তো জানলাম যে আপনার ঘরে দু-দুটো জলের বোতল ভরতি পড়ে আছে। আমি তো মাথায় চিপ-টিপ এজন্যই বসাই না। কী দরকার অত মাথা ঘামানোর?

—আপনি তো সাংঘাতিক লোক!

আশিসদা অন্য বোতলটাও আস্তে আস্তে নীচে মেঝেতে নামিয়ে ধীর পায়ে বাইরের দরজার দিকে এগোন।

—শুনুন—অভি ডেকে উঠল, একটা বোতল নিয়েই যান। আমার দিক থেকে আপনার নাতিকে গিফ্‌ট। আর পারেন যদি মাঝেমধ্যে সময় করে আসবেন। দশ বছর পাশাপাশি আছি, আজ দ্বিতীয়বার মুখোমুখি দেখা। ঠিক কি?

বন্ধ জানলা

ভেনিসকে যে কেন সুন্দর বলে স্যান্টা লুসিয়া স্টেশন থেকে বেরিয়েই তার আঁচ পেল সৌরীশ, অদ্ভুত দৃশ্য। এরকমটা ও একেবারেই আশা করেনি। স্টেশনের ঠিক বাইরেই বিশাল ক্যানেল। সামনে শুধুই জল আর জল, সামনে দিয়েই লঞ্চ ছাড়ছে। বলা হয় ভেপরেটে। খানিকটা খোলা, খানিকটা এয়ারকন্ডিশন্‌ড। বাইরে ডিসেম্বরের হাড়-কাঁপানো কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। তাই লঞ্চের বাইরে বসার অ্যাডভেঞ্চার না করে ভেতরে গিয়ে বসে সৌরীশ। এখন ওকে যেতে হবে স্যান মার্কোস স্কোয়ার। স্যান মার্কোসকে বলা যায় ভেনিসের কেন্দ্র। এখানেই আছে সেন্ট মার্কোস ব্যাসিলিকা। ৮২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধর্ম থেকে রাজনীতি সবেরই কেন্দ্রে এই বিখ্যাত চার্চ। তবে এত রাতে অবশ্য চার্চ দেখা যাবে না। সোজা গিয়ে উঠতে হবে হোটেলে। সেটা স্যান মার্কোস স্কোয়ারের থেকে হেঁটে মিনিট খানেকের পথ।

স্যান মার্কোস স্কোয়ারের ভাসমান ডকের কাছে আসতেই দড়ি ছুড়ে ডকের খিলানগুলোর সঙ্গে লঞ্চটাকে আটকানো হল। দু-একটা ভারী দুলুনি দিয়েই লঞ্চ থেমে গেল। লঞ্চ থেকে নেমে ঘড়িটা দেখল সৌরীশ। রাত সওয়া আটটা। বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বইছে, তেমনই ঠান্ডা, চারদিকে শুনশান। দেওয়ালে লাগানো পাঁচকোনা সাঁঝবাতিগুলোর হলদেটে হালকা আলো চারদিকে বেশ আলো-আঁধারি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।—প্রাসাদ, চার্চ আর স্যান মার্কোস স্কোয়ারের ধার দিয়ে লাগানো টিমটিমে আলোর

সারি সন্ধ্যার অবসন্নতা যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। হোটেলের দেওয়া ডিরেকশন অনুযায়ী বেলটাওয়ারের তলা দিয়ে সরু রাস্তা ধরে এগোয় সৌরীশ। হোটেল খুঁজে পেতে বেশি দেরি হল না। একটা রেস্টোর‍্যান্টের পিছন দিকে হোটেলের দরজা। ঢুকেই রিসেপশনে বসে থাকা সুন্দর দেখতে ইটালিয়ান ছেলেটার উদ্দেশ্যে হোটেলের রিজার্ভেশনের প্রিন্ট আউটটা এগিয়ে দেয় সৌরীশ।

ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে কাগজটা পড়ে নেয়। তারপর মাথা নেড়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে ওঠে—বাট, ইউ ডিড নট কনফার্ম ইন দ্য লাস্ট টোয়েন্টিফোর আওয়ারস।—এবার সৌরীশের চমকে ওঠার পালা । কাগজটাতে চোখ বোলায় সৌরীশ। ঠিকই তো, রিজার্ভেশনের কাগজে তো সেরকমই লেখা আছে। হোটেলে ঢোকার অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগে রিজার্ভেশন কনফার্ম আর পেমেন্ট না করলে বুকিং ক্যানসেল হয়ে যাবে।

খানিকক্ষণ অনুরোধ উপরোধ করার পরেই সৌরীশ বুঝে যায় যে ছেলেটার করার কিছু নেই। হোটেল কমপ্লিটলি বুকড। উপায়? ছেলেটা একটা লিস্ট ধরিয়ে দেয়। ভেনিসের অনেক বাসিন্দা তাদের কিছু ঘর কিছুদিনের জন্য ভাড়া দেয়। একমাত্র ভরসা সেটাই। হোটেলগুলো সব বুকড হয়ে যায় অনেক আগে থেকেই। বিশেষত ছুটির দিনে।

অগত্যা, হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে সৌরীশ। অচেনা শহর। তার ওপর শীতের রাত। ভাষাও অন্তরায়। ইতালিয়ান ভাষায় কাউকে বুঝিয়ে বলা সৌরীশের অসাধ্য। সামান্য জানা কয়েকটা শব্দ 'চাও, বোঞ্জোরনো'—এসব বলে ভদ্রতা দেখানো যায়। কিন্তু কারুর সঙ্গে কথোপকথন তো হয় না। তবু পরের দু-ঘণ্টা সৌরীশের কাটল এরকমই তিনটে বাড়িতে ভাড়ার সন্ধানে। দু-জায়গায় বাড়িওলার দেখা মিলল। কিন্তু তারাও অলরেডি বুকড। কোনো ঘর ফাঁকা নেই। তৃতীয় জায়গায় কথা বলার কাউকেই খুঁজে পেল না সৌরীশ। ইতিমধ্যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বেড়াতে এসে এত অসহায় কখনো বোধ করেনি সৌরীশ। কাকভেজা ভিজে গেছে। ঠান্ডাও লাগছে খুব।

চতুর্থ বাড়িটা রিয়্যালটো ব্রিজের কাছে লোককে জিজ্ঞেস করে করে এগোতে থাকে সৌরীশ। চারিদিকে ছোটো ছোটো জানলা। অনেক বাড়ির

দরজা খুলে বেরোলেই নালা। তাদের দরজায় ছোটো সিঁড়ি। সিঁড়ির নীচে নৌকো লাগানো। নৌকো মানে ভেনিসের বিখ্যাত গন্ডোলা। দু-প্রান্ত উঁচু সরু খোলের নৌকো। এই ছোটো নালাগুলো পেরোনোর জন্য ছোটো ছোটো ব্রিজ আছে। তা এই সব ছোটো ছোটো ব্রিজ পেরিয়ে ট্রলিব্যাগ নিয়ে ম্যাপ দেখে এগোতে থাকে সৌরীশ।

আরও আধ ঘণ্টা হেঁটে চতুর্থ বাড়ির সন্ধান পেল সৌরীশ। রাত তখন এগারোটা। ভাগ্য ভালো বাড়ির বাইরের বেল বাজাতে গৃহকর্ত্রীর সাড়া মিলল। বয়স আশির মতো। সাদা চুল। একটু কুঁজো। হাতে লাঠি। দরজা একটু ফাঁক করে সৌরীশের প্রশ্নের উত্তরে নেতিবাচক ঘাড় নাড়ল। নাহ্, এখানেও ঘর ফাঁকা নেই।

সৌরীশ এখন বেপরোয়া। এখানেও না পেলে স্টেশনে ফেরা ছাড়া কোনো উপায় নেই। বৃদ্ধা ইংরেজি বলতে পারেন। সৌরীশ তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করে। যেকোনো ভাবে যদি একটা রাতেরও ব্যবস্থা হয়। অবশেষে উনি একটু ইতস্তত করে বলে ওঠেন—একটা ঘর আছে। আমরা ওটা ভাড়া দিই না। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নেই। তবে তোমার অবস্থা দেখে থাকতে দিচ্ছি। এত রাতে আর কোথাও পাবে বলে মনে হয় না।

সৌরীশ তো এককথায় রাজি। মিনিট কুড়ি বাইরে বসতে হল। ঘরটা পরিষ্কার করে উনি ঘরের চাবি সৌরীশকে দিলেন। একতলায় কোণের দিকে ঘর। প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে শেষ ডানদিকে। চাবিটা দিয়ে দরজা খুলেই সৌরীশ অবাক। এত বিশাল ঘর ও আশাই করেনি। ঘরের ভেতরে একটা ডবল বেড। বিছানার পাশের দিকে একটা আট ফুট উঁচু দেওয়াল আলমারি। বিছানার অন্য পাশটায় বেশ খানিকটা জায়গা। তারপর একটা সোফা। সোফার পিছনে বিশাল জানলা। দু-দিকে তিনটে করে কাঠের টুকরো জোড়া সরু পাল্লা—ছিটকিনি দিয়ে আটকানো। জানলায় লম্বা হলুদ রঙের পর্দা প্রায় সিলিং থেকে মাটি পর্যন্ত। ঘরের দেওয়ালে দুটো ইতালিয়ান ফ্রেস্কো পেন্টিং-এর ছবি। ঠিক এরকম ঘরেই থাকার ইচ্ছে ছিল সৌরীশের। এত কম ভাড়ায় এরকম ঘর। ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করে চট করে গুছিয়ে নেয়। এখান থেকে মিলানের টিকিট কাটা আছে দু-দিন পরে।

হোটেলের মতো সাজানো-গোছানো না হলেও এখানে এ দু-দিন দিব্যি চলে যাবে।

ব্যাগ থেকে আঁকার সরঞ্জাম বের করে গুছিয়ে রাখে সৌরীশ। সৌরীশ আর্টিস্ট। ইদানিং ওর আঁকার বেশ নামডাক হয়েছে। ভেনিসে ও ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গেই আসতে পারত। তাহলে এত ঝুটঝামেলা পোহাতে হত না। কিন্তু, একজন আর্টিস্টকে যে স্পেস দিতে হয়, নিজের মতো করে ঘোরার যে সময় দিতে হয়, সেটা ট্রাভেল এজেন্সিগুলো দেয় না। সবসময় ঘড়ির কাঁটা বেঁধে ঘোরা। এই তো আসতে আসতে শত ব্যস্ততার মধ্যেই নালাগুলো দেখতে প্রত্যেকবার দাঁড়িয়ে পড়ছিল সৌরীশ। নালার সবুজ জলে পাশের বাড়িগুলোর থেকে হলদেটে আলো পড়ে যে আঁকিবুঁকি সৃষ্টি করেছিল, তা কি আর ট্যুরিস্ট গাইডে থাকে। বাড়ি আর নালাকে আলাদা করা যাচ্ছিল না। তা এ সব কি আর নিজে নিজে না ঘুরলে দেখা যায়?

প্রথম রাতে ভালোই ঘুম হল সৌরীশের। ঘুম যখন ভাঙল সকাল তখন দশটা। বাইরের জানলা বন্ধ বলে ঘুম আগে ভাঙেনি। দ্রুত পোশাক পরিবর্তন করে ব্রেকফাস্ট রুমে চলে এল সৌরীশ। বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট অর্থাৎ ব্রেকফাস্টটাও থাকার খরচের মধ্যে ধরা আছে। ক্রয়সা, চিজ, পাউরুটি, কলা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারল সৌরীশ। তারপরই ক্যামেরার ব্যাগটা নিয়ে চলে এল রাস্তায়।

বাড়িটা কত পুরোনো কে জানে? একটা দিক একদম খালের ধারে। অন্যদিকটা দিয়ে বেরোলে একটা সরু গলি। গলির দিকেই সৌরীশের ঘরটা। নানান জায়গায় পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে গেছে। নীচের দিকে সরু সরু লাল ইট আঁকাবাঁকা দাঁতের মতো বেরিয়ে আছে। শ্যাওলাও ধরেছে। বেরিয়ে ভেনিসের সরু সরু গলি দিয়ে সৌরীশ হাঁটতে থাকে। বেশিরভাগ বাড়ির রং হালকা হলুদ বা গোলাপি, জানলাগুলো সবুজ। লাল টালির ছাদ। অনেক বাড়িতে জানলার বাইরে গ্রিল দিয়ে ঘেরা ছোটো জায়গায় টব রাখা। নানান রঙের ফুল তাতে।

এ শহরের সব বাড়িই কয়েক-শো বছরের পুরোনো। রাস্তাগুলো এত সরু যে সূর্যের আলো প্রায় পড়েই না। কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন। খানিক বাদে

বাদে এই সরু সরু রাস্তাগুলো এসে কোনো একটা স্কোয়ারে মিলিত হয়েছে। এই স্কোয়ারগুলোতে হয় চার্চ, নাহয় কোনো বিখ্যাত বিল্ডিং। সবই পাথরের রাস্তা।

পায়ে হেঁটে আর মাঝেমধ্যে গ্র্যান্ড ক্যানালের উপর দিয়ে লঞ্চে চড়ে ভেনিস ঘুরে বেড়াল সৌরীশ। প্রথমেই গেল স্যান মার্কোস স্কোয়ারে। সেন্ট ম্যার্ক ব্যাসিলিকায়। ডজের প্রাসাদ, অ্যাকাডেমি গ্যালারি ঘুরে ও যখন বাড়ি ফিরল তখন সন্ধ্যে ছ-টা। রাস্তার আলোগুলো সবে জ্বলে উঠেছে। সারা দিন বৃষ্টি হয়নি। এখন আবার মেঘলা হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যায় ভেনিস আলো ছায়ায় আরও সুন্দর হয়ে ওঠে, কিন্তু সৌরীশের আর ঘোরার এনার্জি নেই। ঘরে ঢুকে ছবি আঁকতে শুরু করে সৌরীশ। অ্যাক্রিলিক অন ক্যানভাস। সারাদিন ঘুরে অনেক ছবির প্লট এসেছে মাথায়। কিন্তু সবার আগে এ ঘরটার একটা ছবি আঁকবে ও। প্রায় চোদ্দো ফুট উঁচু সিলিং। বিশাল জানলা, ঘরের আসবাব, কাঠের মেঝে সব মিলিয়ে ঘরটা খুব পছন্দ সৌরীশের। এরকম ঘর আগে কখনো দেখেনি। তুলির টানে হুবহু একই ভাবে ফুটিয়ে তুলতে থাকে সৌরীশ। একপাশে রাখা সোফা, কাঠের মেঝের ফুলে ফেঁপে ওঠা, কারুকার্য করা বিশাল কাঠের চেস্ট অফ ড্রয়ার সব কিছু নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে থাকে। হঠাৎ মোবাইলে অ্যালার্মটা বেজে ওঠে। অ্যালার্মটা বন্ধ করার জন্য উঠতে গিয়ে সারা গায়ে শিহরন খেলে গেল সৌরীশের।

কারণটা আর কিছুই নয়। ঘরে ও একা নয়। খাটের অন্যপ্রান্তে একটা ন-দশ বছরের মেয়ে বসে আছে। চোখ দুটো স্বপ্নালু। মুখে বেদনার ছাপ। সোনালি চুলগুলো এলোমেলো হয়ে মুখের সামনে এসে পড়েছে। দরজা খোলাই ছিল। কখন এসে ঢুকেছে কে জানে।

—কী নাম তোমার? ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করে সৌরীশ।

মেয়েটার ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে, কিন্তু কিছু বলে না। ফের একই প্রশ্ন করে সৌরীশ। এবারেও মেয়েটা চুপ। ইংরেজি বোঝে না হয়তো।

—ছবি আঁকা দেখতে তোমার ভালো লাগে? মেয়েটা উত্তর দেয় না। ভাবলেশহীন মুখে কোনো পরিবর্তন ধরা পড়ে না। স্বাভাবিক তো মেয়েটা! বোবা?



যাক্ গে। সৌরীশ মেয়েটার উপস্থিতি প্রায় অগ্রাহ্য করে ফের আঁকতে শুরু করে। ন-টা নাগাদ যখন সেদিনকার মতো ছবি আঁকা শেষ করে সৌরীশ উঠে দাঁড়ায় তখন মেয়েটা নেই। কখন নিজের ঘরে চলে গেছে। পিৎজা নিয়ে এসেছিল সৌরীশ। সেটাই মাইক্রোওভেনে গরম করে খেয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ওর মনের মধ্যে একটা জিনিস খচখচ করতে থাকে। ছবি আঁকতে আঁকতে বার তিনেক আড়চোখে মেয়েটাকে দেখেছে। চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত সারল্য। বিভোর দৃষ্টিতে ছবি আঁকা দেখছিল। এতক্ষণ চুপচাপ বসে—একবারও কথা বলল না। কাছে এসেও ছবিটা দেখল না।



পরের দিনটাও সৌরীশের সারাদিন ঘুরে ঘুরে কাটল। ভেনিসের প্রত্যেকটা বাড়িই যেন আলাদা রকমের। সব বাড়িই তাদের চারপাশের পরিবেশ নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটা অলিগলি স্কোয়ারই যেন অন্যরকম। ছোটো ছোটো গলির মধ্যে নামকরা ডিজাইনার ব্র্যান্ডের দামি দোকান। বিশাল বিশাল পাথরের প্রাসাদ আর তার পাশেই নানান রঙে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা ছোটো ছোটো বাড়ির সহাবস্থান। মাঝেমধ্যের সুন্দর বাগানগুলোকে যেন সমুদ্রের থেকে চুরি করে আনা হয়েছে।

ভেনিস শহরটা বড়ো নয়। ঘুরতে ঘুরতে চার্চ স্যান সিমোনো পিক্যোলোয় পৌঁছে গেল সৌরীশ। চার্চের ওপরে বিশাল তামার ডোম।

সেখান থেকে আবার হেঁটে ক্যা পেসারো প্যালেস। এই প্যালেস তৈরি করতে গিয়ে বিখ্যাত আর্কিটেক্ট ব্যালদাসারে মারা যান। তাঁর কেন যেন মনে হত যে এই বিল্ডিং কখনোই বোধ হয় শেষ করতে পারবেন না। এত জটিল এর স্থাপত্য। এখন এ বিল্ডিং একটা ব্যাঙ্ক ব্যবহার করে। এরপর সৌরীশ গেল বিশ্ববিখ্যাত ব্রিজ 'পন্টে দ্য রিয়াল্টো' দেখতে। ১৪৪০ সালে গ্র্যান্ড ক্যানেলের উপর দিয়ে এই ব্রিজ তৈরি হয়। এর উপর দিয়ে হেঁটে গ্র্যান্ড ক্যানেলের একদিক থেকে অন্যদিকে যাওয়া যায়। ছবি তোলার আদর্শ জায়গা। ভেনিসের বুক চিরে গ্র্যান্ড ক্যানেল আর তা দিয়ে সার বেঁধে চলেছে দাঁড়বাওয়া কালো গন্ডোলা। পরপর বেশ কিছু ছবি তোলে সৌরীশ।

ভাবতেও অবাক লাগে ভেনিস মানুষেরই হাতে তৈরি। ছোটো ছোটো খালগুলো মাটি কেটে তৈরি করা হয়েছিল আর সেই তোলা মাটি দিয়ে ছোটো ছোটো দ্বীপগুলোকে আরও উঁচু করা হয়েছিল। এরকম ১১৮ টা দ্বীপ নিয়ে আজকের ভেনিস। ব্রিজ দিয়ে একটার সঙ্গে অন্যটা যুক্ত। বারো-তেরো ফুট চওড়া খালগুলোয় 'ভেপরেট' চলে না, চলে শুধু সরু গন্ডোলা।

চারটে নাগাদ ফিরে এল সৌরীশ। রাত দশটায় মিলানে যাওয়ার ট্রেন। ন-টায় বেরোলেই হবে। একটা ওয়াটার ট্যাক্সি কোম্পানির নাম্বার নিয়ে এসেছে। ওটাতে ফোন করলেই হবে। আধ ঘন্টা আগে। যাওয়ার আগে ছবিটা শেষ করে যেতে চায় ও। মাঝে আর মাত্র কয়েকটা ঘন্টা।

ঘরটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার। ঢুকেই আলোগুলো জ্বেলে দেয় সৌরীশ। জানলার দু-দিক দিয়ে পর্দা ঝোলানো। পর্দা সরিয়ে জানলা খোলার চেষ্টা করে। কাচের জানলা। তার বাইরে কাঠের পাল্লা। ছিটকিনি খুলে কাঠের পাল্লা বাইরের দিকে খোলার চেষ্টা করে। কিন্তু হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও পাল্লা খোলে না। ঠিক আছে, বন্ধ জানলারই ছবি আঁকবে সৌরীশ। অ্যাক্রিলিকের ছবিটার উপর চারকোল দিয়ে জানলাটা আঁকতে থাকে সৌরীশ। হঠাৎ মনে হয় ঘরে ও একা নেই। ঘাড় ঘোরাতেই দেখে ধারণাটা ঠিক। আবার সেই মেয়েটা গতকালের মতো খাটের সেই একই জায়গাতে বসে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

দরজা কি বন্ধ ছিল না! ঠিক খেয়াল হল না সৌরীশের। হয়তো

ভেজানো ছিল। আবার দরজা খুলে ঢুকে পড়েছে। আজকে মেয়েটা একটা লাল রঙের ফ্রক পরেছে। চুলটা পেছনে বাঁধা। মুখে সেই বেদনার ছাপ। আরও যেন তীব্র।

—তোমরা কি বেড়াতে এসেছ?—কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সৌরীশ। উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করে—বাবা-মা কোথায়? মেয়েটা তবু চুপ করে থাকে। এখনও দৃষ্টি নিবদ্ধ ছবিটার উপর।

—তুমি এখানে আছ, তা তোমার বাবা-মা জানেন?—বলেই থেমে যায় সৌরীশ। মেয়েটা ওর দিকে ঘুরে তাকিয়েছে। আর কী শীতল সে দৃষ্টি! চোখের নীচটা ফোলা ফোলা। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলে যেমন হয়।

ফিরে এসে আবার আঁকতে বসে সৌরীশ। খানিকক্ষণের মধ্যে জানলাটা এঁকে ফেলে। ঘরের আসবাবপত্র, পেন্টিং—সব কিছুই ঠিকমতো ফুটে উঠেছে ছবিতে। বন্ধ জানলাটাও সুন্দর দেখাচ্ছে। আর বেশি সময় নেই, এবার জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরোনোর ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়েটা এরমধ্যে কখন চুপিসাড়ে চলে গেছে। একবার ল্যান্ডলেডিকে মেয়েটার কথা বলবে কি? দরজা খুলে বেরোতে যায় সৌরীশ। আশ্চর্য! দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। চাবি এনে দরজা খোলার চেষ্টা করতে থাকে সৌরীশ। কিন্তু না। লক খুলছে কিন্তু দরজা খুলছে না। ন-টা প্রায় বাজতে চলেছে। অবিলম্বে বেরোতে হবে। রিসেপশনে ফোন করে ও। রিং হয়ে যাচ্ছে। অন্য কোনো নাম্বার। খেয়াল হল ল্যান্ডলেডি একটা কার্ড দিয়েছিলেন। সে নাম্বারেও ফোন করে। ফোন সুইচ্‌ড অফ। জানলা খুলে বেরোনোর উপায় আছে কি? কাচের জানলার সার্সিটা খুলে ফের বাইরের কাঠের জানলাটা, খোলার চেষ্টা করতে থাকে সৌরীশ। মিনিট পাঁচেক চেষ্টা করার পর টের পায় ওই জানলা খোলা ওর পক্ষে অসম্ভব। বাইরে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। তার আওয়াজ আসছে। চিৎকার করলেও যে কেউ সাড়া দেবে তা মনে হয় না। বন্ধ ঘর যে কী অসহ্য হতে পারে, গত পনেরো মিনিটেই তা টের পাচ্ছে সৌরীশ। ঘরের বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠছে। দমবন্ধ লাগছে।

হঠাৎ সৌরীশের মনে হল একটা কান্নার আওয়াজ আসছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বাচ্চা মেয়ের কান্না। জানলার সার্সি খোলায় বৃষ্টির শব্দটা আরেকটু

বেড়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কান্নার শব্দটা। সেটা যেন ঘরের মধ্যে থেকেই। কিন্তু ঘরের চারদিকে তাকিয়েও কাউকে খুঁজে পেল না সৌরীশ। ট্রেন যে মিস করবেই তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। আবার ফোন করার চেষ্টা করে রিসেপশনে। নাহ্ রিং হয়ে যাচ্ছে। কেউ নেই ওখানে? হয়তো বৃষ্টিবাদলার দিন বলে নতুন কেউ আর আসবে না, তাই রিসেপশনও ফাঁকা।

আরও এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে যায় সৌরীশ। তারপরে হাল ছেড়ে দেয়। মাথাও আর কাজ করছে না। যাহোক, কাল সকালে করা যাবে। হয়তো তখন ফোনেও পাওয়া যাবে। বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যেও কান্নার আওয়াজটা যেন পায় সৌরীশ। আবার আলো জ্বালে। নাহ্ কেউ নেই। বাইরে তখনও ঝিমঝিমিয়ে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। ওই বৃষ্টির শব্দটাই সৌরীশের কাছে বাইরের পৃথিবী, ঘরের বাইরের প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ সবই যেন মিশে আছে তাতে।

রাতের ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমটা ভোরের দিকে হয়তো একটু গাঢ় হয়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল ছ-টা। ঘরের ভেতরে এখনও অন্ধকার। সকাল হয়েছে বোঝার উপায় নেই। নেহাত ঘড়ি দেখেই সময় বোঝা, বৃষ্টি ছেড়ে গেছে। বিছানা ছেড়ে উঠে আবার দরজা খোলার চেষ্টা করল সৌরীশ। অবাক ব্যাপার, এক ধাক্কাতেই দরজা খুলে গেল।

বাইরের সরু প্যাসেজে বেরিয়ে এসে চাবি দিয়ে দরজাটা কয়েকবার খোলা বন্ধ করে দেখে নিল। নাহ্, লকের কোনো দোষ নেই। রিসেপশনে যে ছেলেটা বসে, তাকে রাগের মাথায় নানান কথা বলে এল সৌরীশ। গতকালের ভাড়া দেবে না, তাও জানিয়ে এল। কী হ্যারাস্‌মেন্ট। সারা রাত ঘরের মধ্যে আটকে পড়ে থাকা। যদি শরীর খারাপ হত। তবে অদ্ভুত ব্যাপার। রিসেপশনের লোকটা বলল ওখানে সবসময়ই কেউ-না-কেউ ছিল। ফোন এলে তারা অবশ্যই ধরত। আর বিশেষ করে যখন এত বার ফোন করা হয়েছে।

সকাল সাড়ে আটটায় মিলানের একটা ট্রেন আছে। একটু জোরে হাঁটলে মনে হয় পাওয়া যাবে। ওই ভূতুড়ে ঘরে সৌরীশের আর এক মুহূর্তও থাকার ইচ্ছে নেই। ব্যাগ গুছিয়ে ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে।

বাড়ির সামনের সরু গলি যেখানে আরেকটু চওড়া রাস্তায় এসে পড়েছে সেখানে একটা লোক ছাতা বিক্রি করছিল। দেখেই বোঝা যায় বাংলাদেশি। ফোনে কারও সঙ্গে বাংলায় কথা বলছিল। তাকেই স্টেশনের ডিরেকশানটা জিজ্ঞাসা করল সৌরীশ। বাংলাতেই প্রশ্ন করল ও। ডিরেকশান দিয়ে লোকটা উৎফুল্ল হয়ে বলতে থাকে—আমার নাম পরান। খুলনায় আমাগো বাড়ি আছে। তা আপনিও বাংলাদেশের?

—না, না, আমি কলকাতার।

—তা এখানে কোথায় আসা হইছে?

—ওই যে হলুদ বাড়িটা দেখছেন না, ওখানেই ছিলাম গত দু-দিন, তা কী বিপদেই না পড়েছিলাম। গতকাল রাতে হঠাৎ ঘরের দরজা দেখি আর খোলে না।

—বলেন কী। তা হোটেলে কেউ ছিল না?

—না, আমি ফোন করে করে হয়রান হয়ে গেছি, কেউ ফোন ধরেনি আর এখানে আমি তো কাউকে চিনি না। তার মধ্যে আবার একটা বাচ্চা মেয়ের কান্না। সারারাত জুড়ে। মনে হচ্ছিল ঘরের মধ্যেই আছে। অথচ দেখতে পাচ্ছিলাম না।

—আশ্চর্য। স্বপ্ন দেখেন নাই তো! লোকটার মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে।

—না, না। আমার ঘরে একটা বাচ্চা মেয়ে ঢুকে পড়ত। এই ন-দশ বছর বয়স হবে। বোবা-কালা। কোনো প্রশ্নের উত্তরও দেয় না। মেয়েটাকে দেখে মনে হয় ও বাড়িতেই থাকে। তারই কান্না কি না কে জানে।

—নাহ্ ও বাড়িতে তো কোনো বাচ্চা মেয়ে নাই। তবে হ্যাঁ, আমি শুনিচি, বছর কুড়ি আগে ওখানে এক ছোট্ট পরিবার ছিল। বাবা-মা আর মেয়ে থাকত। মেয়েটার বাবা-মায়ের নাকি ছিল মাথা খারাপ।—মাথার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে লোকটা—মেয়েটাকে ছোট্ট থেকে ও বাড়ির এক ঘরে বন্ধ করি রাখত। বাইরের হাওয়া বাতাসে নাকি মেয়ে খারাপ হইয়া যাইব। মেয়েটা শুনিচি বাইরে যাবার জন্যি ছটফট করত আর ওর বাবা-মা মার দিয়া ফের ঘরে ঢুকাইয়া দিত। খাওয়া-দাওয়া সব ও ঘরে, সব দরজা-জানলা সবসময় বন্ধ। ভাবেন তো, কী আজব অত্যাচার!

—তা মেয়েটার শেষে কী হয়েছিল?

—যা হয়, খবর পেয়ে পুলিশ উদ্ধার করে। কিন্তু তখন অলরেডি মেয়েটার মাথা গেছে বিগড়ে। কিছুই বোঝে না। কারুর সঙ্গে তো কখনোই কথা বলে নাই। বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারেই হয় নাই। আমি এখানকার পুরানো লোকেদের কাছেই সব শুনিচি। মেয়েটা সবসময় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। বন্ধ ঘর দেখলেই পাগলের মতো হয়ে যেত। জানলা দরজা ধাক্কা দিত। উদ্ধার হওয়ার বছর দেড়েক বাদে মারাই গেল। আপনি কি ওরেই...?

সৌরীশ আর দাঁড়ায় না। হাঁটতে শুরু করে।

লোকটা পিছন থেকে আবার ডেকে ওঠে—ও দাদা আপনি কি ওই মেয়েটারেই দেখেছেন? কী সব্বোনাশ!

সৌরীশ ঘাড় ফেরায় না। আনমনে হাঁটতে থাকে। কেন জানে না ওর আর ট্রেন ধরতে ইচ্ছে হয় না। মন জুড়ে ওই ছোট্ট মেয়েটা। খানিকবাদে একটা বড়ো খোলা চত্বর পেয়ে সেখানে বেঞ্চে বসে পড়ে। জনশূন্য চত্বর। সামনের সার সার বাড়ির বন্ধ জানলা ওই মেয়েটার কথা আরও বেশি করে মনে পড়ায়। কান্নার আওয়াজটা এখনও যেন কানে ভেসে আসছে। ওই মেয়েটাই কি। ...মনটাকে অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য সৌরীশ ব্যাগ থেকে ছবিটা বের করে। দেখা যাক দিনের আলোতে কেমন লাগছে। কিন্তু ছবিটা দেখেই ভীষণ চমকে ওঠে ও, একী! সবই একরকম আছে। শুধু ঘরের কাঠের জানলাটা হাট খোলা। গলির অন্যদিকের গোলাপি বাড়ির বারান্দাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেখানে টবে রাখা ভারি সুন্দর নীল রঙের অজানা ফুল। ওই মেয়েটার চোখের মণির মতো তার রং।

আমরা নেই

১২ সেপ্টেম্বর ২০১০, লা রিনকোনাডা, পেরু

রোজমেরি স্যানচেজের বয়স মোটে নয়। তবু এর মধ্যেই ওর হাতের তালুর উপর দিকটা পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। আন্দেজ পর্বতমালার চড়া রোদে রোজ এগারো ঘণ্টা কাজ করার ফল। তবে না করেই বা উপায় কী? ওকে যে ফের স্কুলে ভরতি হতে হবে। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে ওর স্কুলে যাওয়া বন্ধ। বেশিরভাগ বন্ধু আজও স্কুলে যায় আর রোজমেরি?

রোজমেরির কাজ সোনার খনি থেকে বাতিল করা পাথরের টুকরো ভেঙে সোনা খোঁজা। যদি কোথাও কোনো সোনা থেকে থাকে। ও তাই ভারী হাতুড়ি দিয়ে পাথরগুলোকে আরও ছোটো ছোটো করে গুঁড়ো করে সোনার নাগেট খোঁজে। গত বছর একবার দু-গ্রাম সোনা পেয়েছিল রোজমেরি। ফের যদি ওরকম মেলে। মাত্র চারগ্রাম সোনা হলেই হল। এক বছরের জন্য স্কুল যাওয়া নিশ্চিন্ত।

ওর বাবাও লা রিনকোনাডার সোনার খনিতে কাজ করত। ছোটো একটা মাইনিং কোম্পানির হয়ে। তারপর হঠাৎ একদিন খনির মধ্যে বিস্ফোরণে ওর ডান হাত আর পা উড়ে যায়। খনিতে যারা কাজ করে তাদের অনেকেরই এই অবস্থা হয় অনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের জন্য। ফল একটাই। মৃত্যু বা একেবারে অকেজো হয়ে যাওয়া। তাই তো ওরা বলে, 'আল লেবোর মে ডয়, নো সে সি ভলভেয়ার'। কাজে যাচ্ছি, জানি না ফিরব কি না।

সেদিনও রোজমেরি রোজকার মতন পাথর গুঁড়ো করছিল। সোনার কথা ভাবলে ভারী হাতুড়ি তুলতে একটু কম কষ্ট হয়। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে সোনা না পেয়ে হাতুড়ির ওজন যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে, ১৭,০০০ ফুট উচ্চতায় বাতাসে অক্সিজেন অতি সামান্য। তাই একটুতেই যেন দম আটকে আসে, তবু থামলে চলবে না। আবার সজোরে হাতুড়ি বসায় রোজমেরি।

ঠং—ধাতব একটা শব্দ। পাথরটা দু-টুকরো হতেই ধাতব শব্দটার কারণ বুঝল রোজমেরি। অদ্ভুত চকচকে একটা জিনিস পাথরের মধ্যে গাঁথা। কিন্তু সোনা নয়। সাবধানে ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে চকচকে জিনিসটাকে পাথর থেকে বার করে আনল রোজমেরি। একটা ধাতব বাক্স। বাক্সটার উপরে এক বর্গ ইঞ্চি জায়গা জুড়ে লাল আভা। ওই জায়গাটায় হাত রাখল রোজমেরি। হাত রাখামাত্র লাল আভাটা আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হতে শুরু করল। জায়গাটাও সামান্য গরম হয়ে উঠল। রংটা এবার লাল থেকে বদলে বেগুনি হতে শুরু করল। বেগুনি থেকে নীল, নীল থেকে হলুদ। রং ক্রমাগত বদলাতে থাকল। এক অজানা শক্তি রোজমেরিকে আচ্ছন্ন করল। ও অবাক হয়ে বাক্সটার উপর হাত রেখে বসে রইল। কেন জানি ওর মনে হল নিজের উপর আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তার। একটা অজানা যন্ত্র যেন ওকে গ্রাস করছে। মনের গভীরে অনেক দূর থেকে কে যেন ওর সঙ্গে কথা বলছে। কনকনে বাতাসের ফিসফিসানির থেকেও স্পষ্ট যেন সে আওয়াজ।

১৩ জুলাই ২০১৯, বোল্ডার, কলোরাডো, আমেরিকা

বোল্ডার হল ইউনিভার্সিটির শহর। রকি মাউন্টেনের পায়ের কাছে ছবির মতো এই শহর। কলোরাডো ইউনিভার্সিটির হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বাস। শহরের কেন্দ্রে পার্ল স্ট্রিট মল। মল বলতে অবশ্য লাল ইট বাঁধানো রাস্তার দু-দিকে সার দিয়ে দোকান, ক্যাফে। চারটে ব্লক জুড়ে মল। মলের একপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়। রকি মাউন্টেন যেন মলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে লাল রঙের রাজকীয় পোশাকে। বোল্ডারের আরেকটা বৈশিষ্ট্য এখানকার ঝকঝকে মেঘমুক্ত সকাল। বছরের তিন-শো দিনেরও বেশি মেঘমুক্ত রৌদ্রঝলমলে আকাশ। তা আজ সেরকমই এক সকাল।

শনিবারের দুপুর। পার্ল স্ট্রিট মলের রাস্তায় বেজায় ভিড়। রাস্তায় মাঝেমধ্যে কলাকুশলীরা দাঁড়িয়ে নানান ধরনের শো করছে। কোথাও মুখোশপরা আর্টিস্ট নেচে নেচে বেহালা বাজাচ্ছে, তো কোথাও আগুন নিয়ে খেলা। ইট-বাঁধানো রাস্তায় তাই মাঝে মাঝেই জটলা। শো দেখতে লোকের ভিড়। এ ছাড়া রাস্তায় একটু বাদে বাদেই পাতা বসার বেঞ্চ। সেখানে বসে কোথাও কেউ নির্বিচারে চুরুট খাচ্ছে, তো কোথাও দু-জনে বসে দাবা খেলছে। সেরকমই একটা ফাঁকা বেঞ্চে একা বসে আছে বছর সতেরোর একটি মেয়ে। চেহারাতে ল্যাটিন আমেরিকার ছাপ। ছোটোখাটো, গোলগাল চেহারা, চাপা রং, উজ্জ্বল চোখ। হাতে একটা ছোটো ল্যাপটপ নিয়ে কী যেন ভাবছে। আশেপাশে কী হচ্ছে, কারা যাচ্ছে কোনো কিছুতেই যেন নজর নেই।

অনেকেই কিন্তু একে চেনে। রোজমেরি স্যানচেজ। কলোরাডো ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারে মাত্র সতেরো বছর বয়সে কাজ করছে। এরমধ্যেই তেরোটা বড়ো বড়ো আবিষ্কার, অজস্র রিসার্চ পেপার। বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রতিভা বলে স্বীকৃত।

পেরুর অজানা-অচেনা একটা গ্রাম থেকে সেরা বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা—স্বপ্নের মতো উত্থান রোজমেরির, এক হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান। মাত্র এগারো বছর বয়সে পেরুর ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চে প্রথম। বারো বছর বয়সে কৃত্রিম স্যাটেলাইটের উপর সৌরশক্তির প্রভাব নিয়ে রোজমেরির গবেষণা সারা বিশ্বে হইচই ফেলে দেয়। পনেরো বছর বয়সে আমেরিকা সরকারের বিশেষ স্কলারশিপ পেয়ে আমেরিকা পাড়ি দেয় রোজমেরি। তারপর থেকে আমেরিকায় কলোরাডো স্টেটের বোল্ডারেই থাকে রোজমেরি। রোজমেরির আত্মীয় পরিজন, মা-বাবা সবই হল বিজ্ঞান। ওর সতীর্থরা বলে মাঝরাতেও নাকি ওকে দেখা যায় ল্যাবে বসে কাজ করতে। ওর নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্র থেকে বিভিন্ন তারায় সিগন্যাল পাঠায়।

—রোজমেরি।

হঠাৎ লসনের ডাকে চমকে ওঠে রোজমেরি। লসন ওর থেকে বয়সে অনেক বড়ো। রিসার্চ সেন্টারে একই সঙ্গে কাজ করে।

লসন ফের বলে ওঠে—প্রফেসার রেনো তোমাকে খুঁজছিলেন। তোমার ফোনটা সুইচড্ অফ আছে। ইমিডিয়েটলি ফোন করো। মনে হল খুব আর্জেন্ট।

রোজমেরি মাথা নেড়ে 'ও কে' জানালেও লসন চলে যাওয়ার পরেও চুপচাপ বসে রইল, কোনোরকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে। এই হালকা রোদ, পাহাড় থেকে নেমে আসা মিষ্টি হাওয়া, চারদিকের উৎসব-আনন্দের ছোঁয়া—কোনো কিছুই রোজমেরির মুখের বিষণ্ণতা দূর করতে পারল না।

ওর মাথায় শুধু একটাই প্রশ্ন, উত্তর কেন আসছে না? প্রক্সি সেণ্টুরি তো ৪.৩ আলোকবর্ষ দূরে। ওর পাঠানো প্রথম মেসেজ তো প্রায় সাড়ে চার বছর আগে প্রক্সিয়ানদের কাছে পৌঁছেছে। ওদের উত্তর তো ইতিমধ্যেই চলে আসার কথা। তাহলে কি গণনায় ভুল আছে? ওর ক্যালকুলেশন অনুযায়ী পৃথিবী থেকে ওদের গ্রহের দূরত্ব ৪.৩২৩৪ আলোকবর্ষ। নাহ্ আরেকবার পুরোটা ভেরিফাই করা দরকার।



রাস্তার দিকে নজর ফেরাল রোজমেরি। দলে দলে লোক গল্প করতে করতে চলে যাচ্ছে। রাস্তার মাঝে একটা জায়গায় ফোয়ারা। গানের তালে তালে জল নাচছে আর তার মধ্যে বাচ্চারা। ছন্দ আর জ্যামিতির নকশাটুকু বাদ দিলে বাকিটা পুরোই অর্থহীন। এভাবে জল নষ্ট করা একেবারেই উচিত নয়। এখানে মানুষ এত জল পায় বলে জলের মূল্য বোঝে না।

অথচ ওদের গ্রহে! সামান্য একটু জলের জন্য কত হাহাকার। বড়োলোকেরা আকাশছোঁয়া দামে জল কিনে নিজেদের ব্যবহারের জন্য রেখে দেয়। গরিবেরা পানীয় জলও ঠিকমতো পায় না। জলের জন্য ঘরে ঘরে ঝগড়া—এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যুদ্ধ। যে দেশের যত বেশি জল, সে দেশ তত ধনী। যেসব শস্য চাষ করতে জল বেশি লাগে সেসব শস্য ফলাতে তারাই শুধু পারে। তাই তো ওরা বেরিয়েছিল অন্য গ্রহের সন্ধানে, যেখানে জল আছে—বসতি গড়া যায়। এখন কি ওরা জলের ক্রাইসিস অ্যাভয়েড করতে পেরেছে? কে জানে?



ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রোজমেরি। এক-এক ফোঁটা জল—এক-একটা প্রাণ বাঁচাতে পারে। কিছু জল যদি ওদের গ্রহে নিয়ে যাওয়া যেত।

রোজমেরির প্রলম্বিত ছায়াটা হারিয়ে যায় ভেসে যাওয়া এক ফালি মেঘের ছায়ায়। আর ওর মন হারিয়ে যায় দূরের এক তারায়।

১৪ জুলাই ২০১৯, বোল্ডার

রোজকার মতো রোজমেরি ওর ল্যাপটপ থেকে মেসেজ পাঠাতে শুরু করল। মাঝরাত। পাহাড়ি শহরে এসময় সাধারণত কেউ জেগে থাকে না। তাই এটাই কাজের সবথেকে ভালো সময়। হঠাৎ ল্যাবের রিসিভিং স্টেশনের কম্পিউটারটা আওয়াজ করে উঠল। বিপ্ বিপ্। মেসেজ আসছে। মাইক্রোয়েভ তরঙ্গ। ৪.২৩ মিলিমিটারে। প্রক্সি সেণ্টুরি থেকে। টেলিস্কোপের অভিমুখ দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল রোজমেরি। হ্যাঁ, প্রক্সি সেণ্টুরি তারা থেকেই আসছে। উত্তেজনায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে রোজমেরির।

ল্যাবের ঘরে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলেন ল্যাব-ডিরেক্টার রেনো। সঙ্গে আরও দু-জন। রিসিভিং স্টেশন থেকে এদের কাছেও ফোনে অটোমেটেড কল গেছে। বিরক্ত হলেও রোজমেরি চুপ করে থাকে। এমনিতেও এরা মেসেজ ডি-কোড করতে পারবে না। শুধু রোজমেরির পক্ষেই সেটা বোঝা সম্ভব।

কম্পিউটারে লেখা ফুটে উঠছে। একী! রোজমেরি চেয়ারে বসে পড়ে। ওর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে যায়। ঘরের অন্য কেউ না বুঝলেও রোজমেরি প্রক্সি সেণ্টুরির মেসেজটা পড়েছে। তাতে শুধু দুটো শব্দ—'আমরা নেই।'

রোজমেরির মাথার মধ্যে কথাটা বারবার বাজতে থাকে—আমরা নেই...আমরা নেই।

বহুদূর থেকে প্রফেসার রেনোর কথা ভেসে আসে—রোজমেরি, রোজমেরি! শরীর কি খারাপ লাগছে?

১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯, বোল্ডার

ওভাল শেপের টেবিলে বসে আছেন স্পেস ডেভেলপমেন্ট রিসার্চের তিনজন বিজ্ঞানী। তাঁদের সঙ্গে সারা বিশ্বের আরও পাঁচজন অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী। সঙ্গে ডাক্তার কেমওয়েল আর আমেরিকার সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার জন।

স্পেস ডেভেলপমেন্ট রিসার্চের ডিরেক্টার ড. রেনোই বলতে শুরু করলেন—আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল রোজমেরির পাঠানো মেসেজগুলো দেখে। প্রথমে মেসেজের অর্থ না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিলাম সেগুলো শুধু প্রক্সি সেণ্টুরির তারার উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছিল। আমরা যখন কোনো সিগন্যাল পাঠাই তা সবসময় নির্দিষ্ট কোনো তারার দিকে পাঠানো হয় না। প্রাণের সম্ভাবনা আছে এরকম সব তারাতেই সিগন্যাল পাঠাই।

—প্রক্সি সেণ্টুরির সঙ্গে রোজমেরির সম্পর্ক?

—সেটা বলার আগে আমি ডাক্তার কেমওয়েলকে বলতে বলব রোজমেরির মৃতদেহ থেকে কী পাওয়া গেছে।

কেমওয়েল বলতে শুরু করলেন—রোজমেরি সাধারণ মানুষ ছিল না। শি ওয়াজ এ রোবট। ওর ব্রেন পরিচালিত করত যন্ত্র। সিলিকন চিপ। তাই মানুষ হয়েও ও ছিল অ্যাকচুয়ালি রোবট। ওর হাতে একটা চিপ বসানো ছিল। আর তার নির্দেশ শুনে কাজ করত ওর ব্রেন। তবে এই চিপটা খুব সাধারণ চিপ ছিল না। আমরা এটা অ্যানালিসিসের জন্য ইনটেলের অ্যাডভান্সড রিসার্চ সেন্টারে পাঠাই।

ড. রেনো পাশ থেকে বলে ওঠেন—আর সেখানেই জানতে পারি যে চিপটা পৃথিবীতে তৈরি হয়নি। ইনফ্যাক্ট আমরা আগামী পঞ্চাশ বছরেও এরকম চিপ বানাতে পারব কি না সন্দেহ।

—কী আছে স্পেশাল এই চিপে?

—এই চিপ শুধু ব্রেনকে কম্যান্ড দেয় না, ব্রেনকে অনেক বেশি শক্তিশালী করে তোলে। আর তাই তো রোজমেরি মাত্র নয় বছরে কোথা থেকে কোথায় উঠে এসেছিল। অস্বাভাবিক মেমারি, অসাধারণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা, অন্যভাবে চিন্তার ক্ষমতা—সবই এই চিপের বদান্যতায়।

—তা চিপটা ওর মধ্যে ইমপ্ল্যান্ট করল কে? অন্য গ্রহের জীব তো আর রিমোট নিয়ে বসে ওর মধ্যে ইমপ্ল্যান্ট করবে না।

—হ্যাঁ, এটাই ছিল সবথেকে শক্ত প্রশ্ন। আমরা প্রথমেই পেরুর লা রিনকোনাডায় খোঁজ করি। সেখানে রোজমেরি ছোটোবেলা কেটেছে। জানার চেষ্টা করি অস্বাভাবিক কোনোকিছু ঘটেছিল কি না গত দশ বছরে। অনেক খোঁজার পর জানতে পারি, পেরুর লিমায় ন্যাশনাল সায়েন্স মিউজিয়ামে প্রায় আট বছর আগে একটা অদ্ভুত মেটাল বাক্স জমা পড়ে। ওই ধরনের ধাতু আমাদের পৃথিবীতে নেই। আমাদের ধারণা চিপটা ছিল ওই বাক্সেরই মধ্যে। কারণ বাক্সটা পাওয়া গিয়েছিল লা রিনকোনাডায়, যেখানে রোজমেরিও ছিল। তা ছাড়া রোজমেরির হঠাৎ পরিবর্তন আর বাক্সটার উদ্ধার প্রায় একই সময়ে।

—তাতে কী প্রমাণ হয়?

ড. রেনো বলে ওঠেন—এটা প্রমাণিত নয়। তবে খুব সম্ভবত এটাই হল ঘটনা। আমি যা বলছি তা সত্যিই আপনাদের অবাক করবে। প্রক্সি সেণ্টুরির মধ্যে কোনো একটা গ্রহে আমাদের অনেক লক্ষ বছর আগে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ঠিক সেরকমই সভ্যতা যা নিয়ে আমরা আজ পৃথিবীতে গর্ব করি। হয়তো ওরা আরও অনেক এগিয়েছিল। কিন্তু, যেভাবে অনেক সভ্যতাই হয়তো অতীতে ধ্বংস হয়ে গেছে, সেরকম ওদেরও বিপর্যয় এল। বাধ্য হয়ে ওরা গ্রহ-গ্রহান্তরে খোঁজ করতে শুরু করল কোথায় বাসস্থান পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ গ্রহে তো আর অভিযান করা যায় না, তাই ওরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করল সেই সব গ্রহ যেখানে প্রাণ আছে। গ্রহে প্রাণ থাকার অর্থ হল, খানিকটা হলেও বাসযোগ্য অবস্থা। আর সেটাই ওদের চাই। ওরা ছোটো ছোটো রোবট পাঠিয়ে দিল দূর-দূরান্তের গ্রহে। সেইসব রোবটে লাগানো ছিল অত্যাধুনিক চিপ, যা কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর সংস্পর্শে এলে তার দেহে ট্রান্সফার হয়ে তার বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আর তার মাধ্যমেই ওদের গ্রহে যোগাযোগ করবে। সিগন্যাল পেলেই ওরা বুঝবে অন্য কোনো গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, বাসযোগ্য পরিবেশ আছে। আর রোবট তাদের অনুসন্ধান চালাতে পারবে বহু বছর ধরে যা একজন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়।

—আপনি বলছেন ওই বাক্সটা হচ্ছে আসলে রোবট? আর তা বহুবছর আগে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল?

—ঠিক তাই। ওই বাক্সটা খুব সম্ভবত রোবটটার একটা অংশ, যেখানে ওই চিপটা ছিল। আর আশেপাশের পাথর দেখে বুঝেছি প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে ওরা এই রোবট পাঠিয়েছিল পৃথিবীতে। তখন আদিমানব হোমোইরেকটাস বা হোমোস্যাপিয়েন্সরাও পৃথিবীর মাটিতে হাঁটেনি। তারপরে আবার এটা এসে পড়েছিল লা রিনকোনাডার মতো সতেরো হাজার ফুট উচ্চতার দুর্গম এলাকায়। সেখানে তখন বুদ্ধিমান প্রাণী কোথায়? হাজার হাজার বছর ধরে ওই রোবট মাটির অনেক নীচে চলে যায়। মাটি খুঁড়তে খনি থেকে তা বেরিয়ে পড়ে। আর সেই পাথরই চলে আসে রোজমেরির হাতে। রোজমেরির দেহে রোবট থেকে ট্রান্সফার হয়ে আসে বুদ্ধিমান চিপ যা রোজমেরিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। রোজমেরির মাধ্যমে সিগন্যাল যায় ওদের গ্রহে প্রথম আজ থেকে প্রায় নয় বছর আগে।

—তার মানে তো সাংঘাতিক বিপদ। যেকোনো সময় ওরা পৃথিবীতে অভিযান করতে পারে।

—সে ভয়টা আজ আর নেই। ইনফ্যাক্ট রোজমেরিও একই কারণে আত্মহত্যা করে। ওদের গ্রহে আজ আর কোনো প্রাণ নেই। কী কারণে তা আমরা জানি না। ওদের ওখান থেকে এক মাস আগে মেসেজ আসে —আমরা নেই। রোজমেরি মেসেজটা সঙ্গোসঙ্গো বুঝতে পারে। আর তার পরদিনই আত্মহত্যা। আমরা ডি-কোড করতে পেরেছি দিন দশ আগে। আর তখনই নিশ্চিন্ত হই।

—তা ওরাই যখন নেই, তখন মেসেজ পাঠাল কে?

—হয়তো এরকমই কোনো রোবট, যারা আজও ওই গ্রহে আছে। সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাণও নেই। তবু আজও ওই রোবটগুলো ওদের হয়ে জানিয়ে দেয়—আমরা ছিলাম, আজ আর নেই।

খুঁজে পাওয়া

প্রত্যেকবারই এখানে এসে খানিকক্ষণ বসে থাকে অরিজিৎ। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টের ঠিক এই জায়গাটায়। এতবার এখানে এসেছে যে চারপাশের প্রত্যেকটা দোকান ওর অত্যন্ত পরিচিত। শুধু দোকান নয়, দোকানের ভেতরে কোথায় কী থাকে তাও অরিজিৎ খুব ভালো করে জানে।

গত পনেরো বছরে এই দোকানগুলোর চেহারা একেবারে বদলায়নি তা নয়। কিন্তু অরিজিৎ এতবার এখান দিয়ে গেছে যে, সে পরিবর্তনের ছোঁয়া আর আলাদা করে কোনো চমক জাগায়নি। বলা যায় ধরাই পড়েনি। বাঁ-দিকের ডিউটি-ফ্রি দোকানটাতে একসময় সবরকম পারফিউম সাজানো থাকত। চার-পাঁচজন সেলস গার্ল ঘুরে বেড়াত আর প্রসপেকটিভ কাস্টমার দেখলে মুচকি হেসে 'মে আই হেল্প ইউ' জিজ্ঞেস করে যেত। একটা প্লেন থেকে নেমে আরেকটা প্লেনে ওঠার মাঝের সময়টায় ট্যুরিস্টরা টেস্টার ব্যবহার করে গন্ধবিচার করে বেড়াত।

আর এখন?

ওই দোকানে ঢোকামাত্র প্লেনের বোর্ডিং পাস অটোমেটিক্যালি স্ক্যান হয়ে যাবে। ওই বোর্ডিং পাস থেকেই বেরিয়ে আসবে ওই ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য। কী পছন্দ, কী অপছন্দ। বর্তমানে কী পারফিউম ব্যবহার করেন ইত্যাদি। সে অনুযায়ী সেলস রোবটগুলো গাইড করে নিয়ে যাবে পছন্দের পারফিউম কাউন্টারে। কাউন্টারেও কিন্তু এখন আর পারফিউমগুলো রাখা থাকে না। শুধু মুখে একটা ছোট্ট মাস্ক পরে নিতে হয়। সুইচ টিপলে এক

এক করে সুগন্ধের সুরভি ভেসে আসে। এবার সিলেক্ট করে নাও—যেরকম পছন্দ। এই হল পরিবর্তন। তা, সে পরিবর্তন তো আর শুধু ফ্র্যাঙ্কফুর্টের এয়ারপোর্টের টার্মিনাল টু-তে নয়, সে পরিবর্তন হয়েছে সর্বত্র।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল অরিজিতের। শুধু একটা জিনিসেরই কোনো পরিবর্তন হয়নি। তা হল বুদ্ধর নিখোঁজ হওয়া। তা পনেরো বছর আগের কথা। অরিজিৎ, ডোনা আর বুদ্ধ আমেরিকা থেকে ফিরছিল ফ্র্যাঙ্কফুর্ট হয়ে। বুদ্ধর বয়স তখন সাড়ে পাঁচ। ছটফটে দুষ্টু ছেলে। যেখানেই যায়, মাতিয়ে রাখে। চেনা-অচেনা সবার সঙ্গে গিয়ে আলাপ জুড়ে দেয়। ফ্র্যাঙ্কফুর্টে সেদিন ছ-ঘণ্টার গ্যাপ ছিল। লুফ্‌ৎহ্যানসার কানেক্টিং ফ্লাইট বিকেল পাঁচটায়। মাঝে বেশ খানিকটা সময়। ঘুরতে ঘুরতে টার্মিনালের ঠিক এই জায়গাটায় এসে বসেছিল ওরা। ছোট্ট একটু সময়। কিন্তু তা-ই সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। রুমালের প্রান্ত দিয়ে চোখ থেকে নেমে আসা জলের ফোঁটাটাকে চট করে মুছে ফেলে অরিজিৎ। ঝাপসা হয়ে আসা চোখটা মুছে সেদিনের সেই স্মৃতি থেকে নিষ্কৃতি চায় অরিজিৎ। কিন্তু পায় কই? সে-ই তো ফিরে ফিরে আসে সেদিনটা।

ডোনা ওর স্কুলের এক বান্ধবীর দেখা পেয়ে কথা বলছিল। আর অরিজিৎ? বুদ্ধকে বসতে বলে ঢুকেছিল পাশের ইলেকট্রনিক্সের দোকানটায়। তখন ছোটো ছোটো ল্যাপটপ সবে বেরিয়েছে। বলা হত নেটবুক। ওই নেটবুকই দেখতে ব্যস্ত ছিল অরিজিৎ। মিনিট দশেক বাদে যখন বেরিয়ে এল তখন বুদ্ধও নেই, ডোনাও নেই। হয়তো ডোনার সঙ্গেই কোথাও গেছে বুদ্ধ। পাশের একটা বইয়ের দোকানে ঢোকে অরিজিৎ। বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে। এরকমভাবে যে কতক্ষণ সময় কেটেছে কে জানে! হুঁশ ফেরে ডোনার কথায়।

—অ্যাই, আর তো মোটে দেড় ঘণ্টা বাকি আছে। আবার সিকিউরিটি চেক হবে। এবার যেতে হবে, চলো। সিকিউরিটি চেকেও সময় লাগবে। কোন গেটে দিয়েছে দেখেছ?

—আট নম্বর, বলে একটু থেমে বুদ্ধকে পাশে না দেখে অরিজিৎ বলে ওঠে—বুদ্ধ কোথায়?

—কেন, ও তো তোমার সঙ্গে ছিল।

দু-জনে মিলে দোকানটা থেকে বেরিয়ে আসে। বসার জায়গাটার পাশে কোথাও লুকিয়েছে কি না তা একবার দেখে নিয়ে আশেপাশের দোকানগুলোতে খুঁজতে থাকে। বুদ্ধ দুষ্টু হলেও না বলে চলে যাবে এমন ছেলে নয়।

আধ ঘণ্টা ধরে ওরা খুঁজে চলে। না পেয়ে পাগলের মতো জিজ্ঞাসা করতে থাকে—যাকে পায় তাকে।

—দেখেছেন? লাল-সবুজ ডোরাকাটা জামা, নীল প্যান্ট। বছর পাঁচেকের। এই—এই সাইজের। কোমরের উচ্চতায় হাত রেখে অরিজিৎ জিজ্ঞেস করে।

এইসব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে প্রতিমুহূর্তে কোনো-না-কোনো ফ্লাইট নামছে। আবার প্রতিমুহূর্তে কোনো-না-কোনো ফ্লাইট চলে যাচ্ছে পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে। কিন্তু তা বলে যে কোনো ফ্লাইটে উঠে বসা অত সোজা নয়। প্রত্যেকটার আগে আলাদা আলাদা সিকিউরিটি চেক হয়। তারপরে বোর্ডিং পাস চেক করে দেখে অন্তত দু-জন। আর বাচ্চা একা থাকলে তো কথাই নেই। নিশ্চিত না হলে কখনোই কোনো এয়ারলাইনস তাকে ফ্লাইটে উঠতে অ্যালাউ করবে না।

খানিকবাদে ওরা এয়ারপোর্ট পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তখন আরও এক ঘণ্টা কেটে গেছে, ফ্লাইট মিস করা একেবারে নিশ্চিত। অনেক টাকা গচ্চা। নন-রিফান্ডেবল টিকিট। নতুন টিকিট কাটতে হবে। সে যাক। এখন যে করেই হোক বুদ্ধকে খুঁজে বার করতে হবে।

অরিজিতের মাথা আর কাজ করছে না। ও ধপ করে ডোনার পাশে বেঞ্চে বসে পড়ে। ডোনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে।

—মন শক্ত করো ডোনা। নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কখনো শুনেছ যে, কেউ কোনো এয়ারপোর্ট থেকে হারিয়ে গেছে? ওরা চারদিকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার কাছ থেকে ওর একটা ছবিও নিয়ে গেছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই আমরা জানতে পারব।

কিন্তু সে খবর আর পায়নি ওরা। পনেরো বছর কেটে গেছে। কী না করেছে? পুরো এয়ারপোর্টের সিসিটিভি ফুটেজ খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে।

কোনোরকমে ইমিগ্রেশন এড়িয়ে যদি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসে একথা ভেবে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট শহরেও খোঁজাখুঁজি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। পুরো এয়ারপোর্ট চিরুনি তল্লাশি হয়েছে। প্রত্যেকটা টার্মিনালে। সব প্লেনের যাত্রীতালিকা খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। সেদিন যত বাচ্চা ফ্র্যাঙ্কফুর্ট হয়ে ট্রাভেল করেছে, তার লিস্ট দেখা হয়েছে। তবু বুদ্ধকে পাওয়া যায়নি। নিরুদ্দেশের ছবি হয়ে রয়ে গেছে।

প্রত্যেক বছর অন্তত ছ-বার অরিজিৎ আসে এখানে। কেন আসে তা ও নিজেও জানে না। ওকে এখন এখানকার সবাই চিনে গেছে। এখন সব চুল উঠে মাথা জোড়া টাক। মুখে বয়সের ছাপ। পায়ের জোর খানিকটা কমে এসেছে। আগে ভালো ফুটবল খেলত। কিন্তু দু-বার হাঁটুর অপারেশনের পর খেলা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সামনের দোকানটার দিকে তাকায় অরিজিৎ। ওই—ওই দোকানটার জন্যই যত গণ্ডগোল। যদি না ও ওইদিন নেটবুকটা দেখতে যেত—যদি না ওইদিন ফ্র্যাঙ্কফুর্ট আসত, যদি না—নাহ্, অরিজিৎও জানে যে, এই যদিরই নাম ভাগ্য। আর এরকম ক-টা মুহূর্তই জীবনের সবকিছু পালটে দিয়ে যায়।

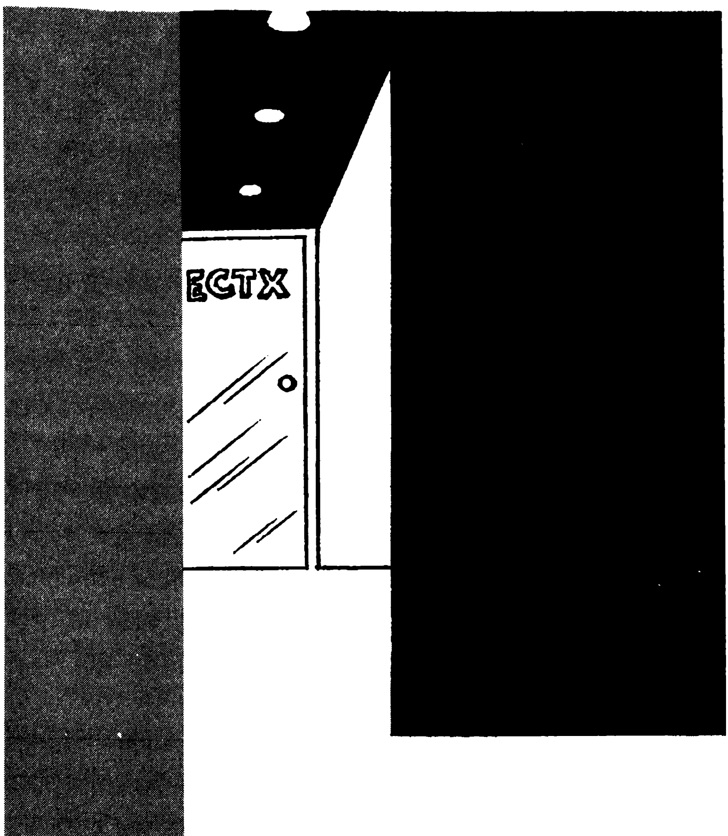
আজ ওর সঙ্গে না আছে বুদ্ধ, না ডোনা। অথচ জীবনটা অন্যরকমও হতে পারত। হয়তো, ওই ছেলেটার মতো—সামনের সোফায় বসা বছর চব্বিশেকের ছেলেটার মতো—বুদ্ধও আজ এখানেই থাকতে পারত।

—বুদ্ধ! বিড়বিড় করে বলে উঠল অরিজিৎ। তারপরেই পাশের আফ্রিকান লোকটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল—ওকেই লক্ষ করছে। ইনফ্যাক্ট আরও যে অনেকের লক্ষ ওরই দিকে তাও ও জানে। জার্মানিতে অনেকেই বুদ্ধর হারানোর ঘটনাটা জানে। আর এও জানে যে তার আকর্ষণে প্রতিবছর বারবার এই টার্মিনালের ঠিক এই জায়গায় ছুটে আসে বুদ্ধর বাবা।

এখনও তিন ঘণ্টা সময় আছে পরের ফ্লাইটের আগে। অরিজিৎ টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়ায়। ট্রলি ব্যাগটাকে সঙ্গে নিয়ে বাথরুমের দিকে এগোয়। চিন্তায় এতটাই বিভোর যে আশেপাশের ব্যস্ত হাঁটাচলার চেহারাটা ওর চোখে পড়ে না। মনে হয় সব যেন থেমে আছে। ঠিক

যেমনভাবে ওর পৃথিবীটা থেমে আছে গত পনেরো বছর ধরে একই জায়গায়।

বাথরুমে ঢোকার ঠিক আগেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অরিজিৎ। টয়লেটের ঠিক আগেই বাঁ-দিকে একটা সরু প্যাসেজ চলে গেছে। আশ্চর্য, এটা তো কখনো চোখে পড়েনি। নতুন হয়েছে? নাহ্, তাও তো নয়। অন্তত দেওয়ালের চেহারা বা পথের চেহারা দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। আরেকটা অবাক ব্যাপার। সব প্যাসেজেরই সামনে মার্কিং করা থাকে।



কোনোটা গেছে গেট ১-৮, তো কোনোটা ৯-১৫, কোনোটাতে লেখা আছে লাউঞ্জে যাওয়ার রাস্তা। কিন্তু এটাতে সেরকম কিছুই লেখা নেই। আর রাস্তাটাও সরু। আচ্ছা, বুদ্ধ সেদিন এদিকে আসেনি তো? ভাবনাটা যে কতটা অলীক তা অরিজিৎ জানে। আর গেলেও তো সে পনেরো বছর আগেকার কথা। সময়ের পিছন দিকে তো আর হাঁটা যায় না। তবু মনে হল আরেকটু এগিয়ে দেখাই যাক না।

রাস্তাটা কীরকম অন্য ধরনের। এয়ারপোর্টের অন্য জায়গার মতো



ঝকঝকে সাদা আলো নেই। কীরকম একটা নীলচে আলো ওপর থেকে এসে পড়েছে সরু রাস্তাটার ওপর। ওই রাস্তা ধরেই এগোতে থাকে অরিজিৎ। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর রাস্তাটা এসে শেষ হয়েছে একটা কাঠের দরজার সামনে। তার ওপরে লেখা 'প্রজেক্ট এক্স'। লেখাটা সবুজ আলোতে ফুটে উঠেছে।

দরজাটা খোলার চেষ্টা করল অরিজিৎ। বন্ধ। নীচ থেকেও কোনো আলো আসছে না। তাহলে কি কেউ নেই? দরজাতে কান পাতল অরিজিৎ। একটা ইনস্ট্রুমেন্টের আওয়াজ ভেসে আসছে। দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিল। তবু কোনো সাড়াশব্দ নেই। হয়তো ভেতরে কেউ নেই। ফিরেই আসছিল। কিন্তু, মনে হল আরেকটু দেখা দরকার। এবার আরও জোরে ধাক্কা দিল অরিজিৎ। ভেতরে কেউ থাকলে নিশ্চয়ই শুনতে পাবে। কিন্তু নাহ্, এবারও কোনো সাড়াশব্দ মিলল না। হঠাৎ চোখে পড়ল দরজার পাশের দেওয়ালে লিফটের সুইচের মতো একটা স্বচ্ছ সুইচ। টিপতেই কাঠের দরজাটা পাশাপাশি খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল অরিজিৎ। আর ঢোকামাত্র দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

স্বল্প আলোকিত একটা ঘর। সারা ঘর জুড়ে হালকা সবুজ আলো। ঘরে কেউ নেই, একটা মিউজিক আস্তে বাজছে। দেওয়ালে প্রজেক্ট এক্স সম্পর্কে নানা কথা লেখা আছে। দেওয়াল মানে অবশ্য বিশাল কম্পিউটার স্ক্রিন—যার উপরে ফুটে উঠেছে পৃথিবীর ম্যাপ, কিছু লোকের ছবি, ডি.এন.এ.-র ছবি। হেড সেট লাগিয়ে বর্ণনাও শোনা যাচ্ছে।

অরিজিৎ প্রজেক্ট এক্স-এর হিস্ট্রি শুনতে থাকে। ২০১১-তে দশ জনকে এই প্রজেক্টে নেওয়া হয়। তাদের বয়স ছিল পাঁচ থেকে ষাটের মধ্যে। এই দশ জনকে স্পেশালি সিলেক্ট করা হয়েছিল তাদের অস্বাভাবিক কিছু ক্ষমতার জন্য। যেমন থমাস ক্যুরিয়নকে নেওয়া হয়েছিল তার ফটোগ্রাফিক মেমারির জন্য। জিয়োভানি পারসানো—১০০ মিটার দৌড়ে যে পরপর দু-বার অলিম্পিকে সোনা জিতে বিশ্বরেকর্ড করেছিল, তাকেও নেওয়া হয়েছিল। নেওয়া হয়েছিল বিখ্যাত বক্তা সাংচেন শুশাইকেও, যার কথা শুনে হাজার হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকত। এরকম আরও সাতজনের কথা লেখা। এদের সবাই যে খুব পরিচিত ছিল তা নয়।

যেমন, সারা প্যাগানেলা—ষাঠ বছরের এই বৃদ্ধাকে দেখতে লাগত বছর তিরিশেকের মতো। এদের সবাইকে নেওয়ার উদ্দেশ্য পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা এদের জিনে কী ব্যতিক্রম থাকার জন্য এদের এরকম অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। সেই ডি. এন. এ. মার্কারগুলো চিহ্নিত করে মিউটেশনের মাধ্যমে উন্নততর মানব প্রজাতি তৈরি করা। এমন এক শ্রেণির মানুষ তৈরি করা যাদের বয়স বাড়বে না, যারা ছুটবে চিতাবাঘের মতো, যাদের গায়ের জোর হবে খুব বেশি...।

আশ্চর্য, এসব যে হচ্ছে তা তো আদৌ জানা ছিল না অরিজিতের। হয়তো গোপনীয়তার কারণে এ খবর কোথাও বেরোয়নি। ২০১১-তে এ জায়গা থেকেই উধাও হয়ে গেছে বুদ্ধ। কিন্তু বুদ্ধ। ও তো তখন মোটে পাঁচ বছরের। একদম সাধারণ—ভাবতে গিয়ে চমকে উঠল অরিজিৎ। সত্যিই কি বুদ্ধ সাধারণ ছিল?

মনে পড়ল, বুদ্ধ একদম খেতে চাইত না, বলত সব কিছুতে পোকা আছে। খাবারের উপর নাকি পোকা ঘুরে বেড়ায়। নানান ডাক্তার দেখিয়েছিল, তারা সবাই বলত এটা ওর মানসিক। খেতে না চাওয়ার বাহানা। এখানে আসার ঠিক দু-দিন আগেই অরিজিৎ জানতে পেরেছিল এর আসল রহস্য। বুদ্ধর অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির কথা। টেস্ট করে দেখেছিল বুদ্ধর দৃষ্টিশক্তি ইগলের থেকেও শক্তিশালী। ও মাইলখানেক দূর থেকেও কোনো কিছু দেখতে পারে। আর খুব ছোটো লেখাও পড়ে ফেলতে পারে। এটা জানতে পারার দু-দিন বাদেই ও এখান থেকে হারিয়ে যায়।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে অরিজিৎ। তাহলে কি বুদ্ধও এখানেই আছে? সারা গায়ে শিহরন জাগে অরিজিতের। অনিবুদ্ধ রয়। বুদ্ধর ভালো নাম। নামটা খুঁজতে থাকে অরিজিৎ। নাহ্, ওর নামটা তো নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরিজিৎ। একটু আশার আলো দেখেছিল।

—দিস ইজ নট দ্য ফুল লিস্ট। দেয়ার আর আদার্স—গলা শুনে চমকে ঘুরে দাঁড়ায় অরিজিৎ। একজন মাঝারি হাইটের সাহেব অরিজিতের সামনে। টাকমাথা, শুধু মাথার পিছন দিকে গোল করে চুল। গায়ে বাদামি জ্যাকেট। পায়ে স্পোর্টস শু।

—বাঙালি? তাহলে বাংলাতেই বলি, বলে ট্রান্সলেটরের সাহায্যে

লোকটা যান্ত্রিক উচ্চারণে বলতে থাকে, এর বাইরেও অনেককে নেওয়া হয়েছিল। এখানে শুধু তাদের নাম আছে যারা স্বেচ্ছায় এতে যোগ দিতে রাজি হয়েছিল। তা না হলে তো হইচই পড়ে যেত।

—বাকিরা? তাদের নাম জানার কোনো উপায় আছে?

—তুমি কি বিশেষ কাউকে খুঁজছ?

—হ্যাঁ, আমার ছেলে। কান্নায় অরিজিতের গলা অবরুদ্ধ হয়ে আসে। আমার পাঁচ বছরের ছেলে। নাম অনিরুদ্ধ রয়। প্রায় পনেরো বছর আগে এখানে হারিয়ে যায়।

—কীরকম দেখতে?

—নীলচে চোখ। বাঁ-চোখের পাশে কালো আঁচিল।

—বুঝতে পেরেছি। অনিরুদ্ধকে চিনি। লোকটা বলে।

—কোথায়? কোথায় ও? চেঁচিয়ে ওঠে অরিজিৎ।

চুপ করে থাকে লোকটা।

—কী.....কী হয়েছে বুদ্ধর? ও বেঁচে আছে তো? লোকটা চুপ করে থাকায় সবথেকে খারাপ চিন্তাটাই আগে মাথায় আসে অরিজিতের।

—হ্যাঁ, তা আছে। তবে তোমার সামান্য দেরি হয়ে গেছে। মাত্র দু-দিন আগে ওকে মঙ্গলে পাঠানো হয়েছে। বসতি বানানোর কাজে। ফিরে আসবে আরও সাত বছর পরে। যেতে-আসতেই তো সাড়ে ছ-বছর লেগে যায়।

অরিজিৎকে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা ফের বলে ওঠে—আয়্যাম রিয়ালি স্যরি। দু-দিন আগে এলেই দেখা পেতে পারতে। তবে সাত বছর ওয়েট করতে হবে না যদি তুমি মঙ্গলে চলে যাও। ও তো ওখানে ছ-মাস থাকবে। তবে তাতে অনেক অনেক খরচ তা তো জানই।

—আমার যা আছে সর্বস্ব দিয়েও যদি মঙ্গলে যাওয়া যায় আমি যাব। ও ছাড়া আমার আছেই বা কে? আমি যাব। আমার সারা জীবনটাই তো ওর অপেক্ষায় কেটে গেছে। উত্তেজিত হয়ে অরিজিৎ বলতে থাকে। চোখ থেকে জলের ধারা নামতে থাকে। আনন্দাশ্রু।

২

অরিজিৎ হাসপাতালে বিছানায় উঠে বসে। বুদ্ধ, বুদ্ধ কোথায়?

তিনজন ডাক্তার সাদা গাউন পরে অরিজিতের বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে একজন ডাক্তার পিট। চোখে ডিম্বাকার ফ্রেমের চশমা। জিজ্ঞাসা করেন—কেমন মনে করছেন? শরীর কেমন লাগছে?

—বুদ্ধ, বুদ্ধ কোথায়? আমি ওর কাছে যাব। মঙ্গালে। আমাকে যেতে দিন প্লিজ, কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে অরিজিৎ।

—বুদ্ধ বলে আপনার কোনো ছেলে নেই। কোনোদিন ছিলও না। পুরো গল্পটা আমাদেরই সৃষ্টি। এর সাহায্যে।—অরিজিতের দিকে একটা ছোটো যন্ত্র এগিয়ে দেয় পিট। এটাই আপনার নার্ভাস সিস্টেমের ওপরে কাজ করে এ ঘটনাটা তৈরি করেছিল। আপনি স্বপ্নে তাই দেখছিলেন।

অরিজিৎ অবিশ্বাসী চোখে বলে ওঠে—না না, হতে পারে না। এত স্পষ্ট। কোথায় গেলেন ওই ভদ্রলোক, যিনি আমার ছেলের কথা বললেন? মাথা ঘুরিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারদিক দেখতে থাকে অরিজিৎ।

—একটু মনে করিয়ে দিই। আপনার ছেলের নাম বুদ্ধ নয়, সোম। আপনি সোমের জন্যই আমাদের কাছে এসেছিলেন। আর সে কারণেই আমরা এই পুরো গল্পটা আপনার মস্তিষ্কে আরোপ করতে বাধ্য হই।

একটু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকে অরিজিৎ। আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়ে ওর। হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে বটে। তাহলে বুদ্ধ বলে কেউ নেই।

—ঘটনাটা সত্যি। তবে আপনার সঙ্গে লিংকড নয়। অন্য একজন তার ছেলেকে হারিয়েছিল ওই এয়ারপোর্টে। তারপর পনেরো বছর ধরে সে ছেলেকে খুঁজেছিল। পরে সে পাগল হয়ে যায়। বহু বছর আগের ঘটনা। সেই ঘটনাকে নিয়েই আমাদের এই গল্প তৈরি। যখনই আপনার মতো কেউ আসে তখন আমরা তাদের এই গল্পটা বলি, যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে।

—কিন্তু আমার হয়েছেটা কী? বলেই থেমে যায় অরিজিৎ। পিটের ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি।

—মনে পড়ছে না সোমের কথাটা?

এবার অরিজিতের খেয়াল হয়।

পিট আবার বলে ওঠে—তাহলে আপনার ডিসিশনটা কী? সোমকে কি মেরে ফেলা হবে? আপনি ওকে চান না?

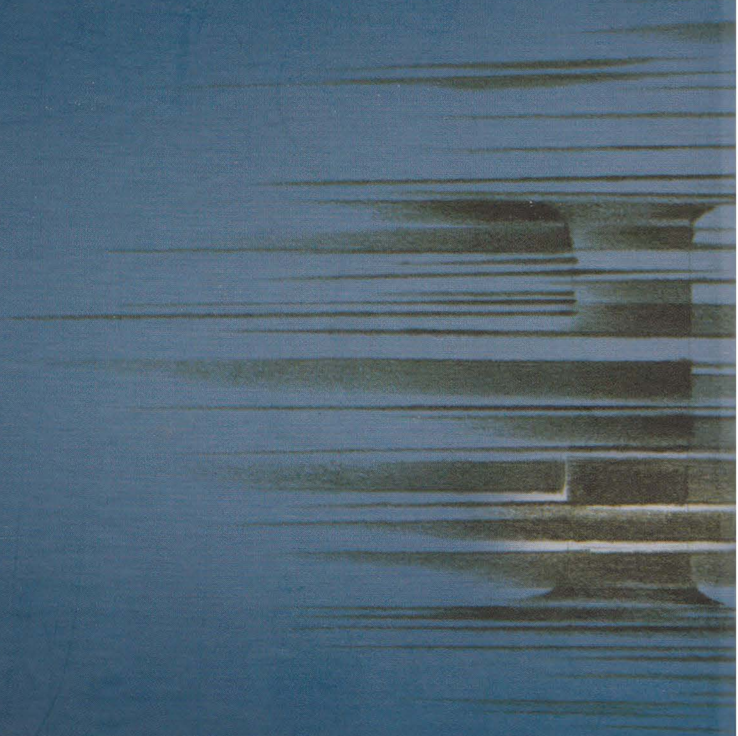
—না না, আর্তনাদ করে ওঠে অরিজিৎ। আমি ওকে আমার ছেলে বলে অ্যাকসেপ্ট করছি।

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে পিট বলে ওঠে, রাইট ডিসিশন। সমাজ অনেক পালটে গেছে। তবুও সামান্য বার্থ ডিফেক্টের জন্য আপনার ক্লোনড ছেলেকে মেরে ফেলাটা মানবিক নয়। হাজার হোক ও তো আপনারই ছেলে। ওর শরীরে তো আপনারই রক্ত। সব থেকে বড়ো কথা ওরও তো একটা জীবনের অধিকার আছে। এত ছোটো কারণে সে অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত নয়।

—তা এটাই তো আপনার ফাইনাল ডিসিশন? পাশ থেকে ড. সাইমন বলে ওঠেন। হাতের আঙুলে ডিফেক্ট থাকা সত্ত্বেও আপনি সোমকে, আপনার ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, ঠিক তো?

—অবশ্যই। ও তো আমারই ছেলে। তা ও যেরকমই হোক না কেন। ছেলের খোঁজে কেউ পনেরো বছর অপেক্ষা করতে পারে, আর আমি ওকে..., কথাটা শেষ করতেও লজ্জা হয় অরিজিতের।

সময় বদলে গেছে। মানুষ নিজের ইচ্ছেমতো ডি. এন. এ. থেকে ক্লোন করে বাচ্চা তৈরি করতে পারে অনেক সহজে। সহজে পাওয়া যায় বলেই হয়তো প্রাণের দাম গেছে কমে। তাই বাচ্চার সামান্য ডিফেক্ট থাকলেও আবার করে এক্সপেরিমেন্ট করতে চান এনারা। সোমের মতো ডিফেক্টিভ বাচ্চারা যাতে হারিয়ে না যায়, বাঁচার সামান্য সুযোগ পায়, সে জন্যই এই গল্পের সাহায্য নেন পিটেরা। যারাই এই অনুভূতির মধ্য দিয়ে যায়, খানিকক্ষণের জন্য হলেও, তারাই ডিসিশন চেঞ্জ করে। সন্তানকে স্বীকার করে নেয়। পিটের অভিজ্ঞতা অন্তত সেরকমই বলে।



শিশু সাহিত্য
সংসদ

₹ 80.00

ISBN 978-81-7955-248-3

9 788179 552483